বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ অধিবেশন।

নৈহাটী—চব্বিশ পরগণা।

কার্য্য-বিবরণী

প্রথম ভাগ

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'বাঁশরী''—সম্পাদকের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন
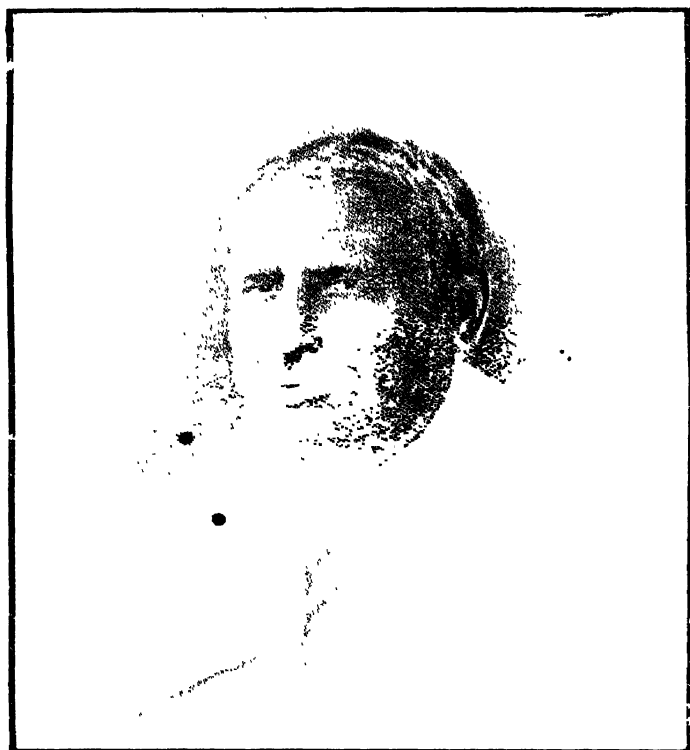
মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই,

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

হে বাঙ্গালার সাহিত্যিকবৃন্দ! আমি আপনাদিগকে সাদরে এই গ্রামে আহ্বান করিতেছি। আমি অ-সাহিত্যিক, তবে বাঙ্গালী। আমার জীবনও একটু বৈচিত্র্যময়—আমার জন্ম লাহোরে, আমি মানুষ হয়েছি বাঙ্গালার ফরাসী জনপদ চন্দননগরে—খলিসানী গ্রামে, চাকরি করেছি—সিমলায় ও কলিকাতায়, আর বাস করেছি—নৈহাটীতে। আমি বাইরে করেছি রাজার কাজ ও রাজার সেবা, আর ঘরে করেছি মিউনিসিপ্যালিটীর সর্দ্দারী, কাজেই শাস্ত্রী মহাশয়ের আজ্ঞা মানতে গিয়ে আমার যে উন্নতি হ'লো, তা প্রায় Log Cabin হইতে White House এর মত।

আমি পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়কে ব'লেছিলাম, "মহাশয়, যার কাজ তারে সাজে, অন্যোপরি লাঠি বাজে—আপনি সারাজীবন এই ক'রে এসেছেন, ওই সভাপতির কাজটা আপনিই নিন্।" কিন্তু তিনি জানালেন যে, তিনি 'দাগী'—অতএব তাঁকে আর একবার উৎসর্গ করা বিধিসম্মত হবে না—শাস্ত্র তাঁরই, সুতরাং কিছুই বল্‌বার রইল না। বেছে নিলেন তিনি আমাকে, এবং আমিও নতশিরে বল্‌লাম "যথা আজ্ঞাপয়তি দেবঃ।"

আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি যে আমার জন্ম লাহোরে এবং এই মহতী মণ্ডলীর মূল সভাপতি মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমানাধিপতির আদি বাসস্থানও বীরপ্রসূ পঞ্চনদে—সুতরাং আজকের সভায় তাঁকে স্রক্‌চন্দন দিয়ে পূজা করবার আমার একটা ব্যক্তিগত অধিকার আছে। আর মহারাজাধিরাজের বংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুদিনের। শ্যামনগর সামন্তেগড় হইতে উৎপন্ন। কাউগাছির গড়

এখনও বিদ্যমান। এ অংশ পূর্ব্বে বর্দ্ধমানাধিপতির জমিদারী ছিল। এখানকার অনেক টোল ও চতুষ্পাঠী বর্দ্ধমান রাজবংশের সাহায্য পেয়েছে। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৈতৃক বাসগৃহের একখানি বড় ঘর (Hall) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্কিমবাবুর সুহৃৎ ৺নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু মহাশয়কে বর্দ্ধমানাধিপ মহাতাব চাঁদ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘর এখনও বিদ্যমান আছে। সাহিত্য-শাখার সভাপতি—বাঙ্গালার সাগর-ছেঁচা ধন অমৃতলালকে আমি সাদরে আহ্বান কর্‌ছি। তাঁকে আর কি বল্‌ব—তিনি নৈহাটীর ঘাটে, পৈঁটের পাটে ব'সে আবার নূতন ক'রে সাহিত্যের মালা গেঁথে যান। আশা করি, তাঁর দেওয়া জিনিষ—আমাদের তেষ্টার জল, চেষ্টার ফল ও জ্যৈষ্ঠমাসের দুপুরবেলার বৃষ্টির চেয়েও মিষ্টি হবে। দর্শনশাখার সভাপতি পূজনীয় তর্করত্ন মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়ে এই সভার দর্শনশাস্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করিবার জন্য আহ্বান কর্‌ছি। তিনি আমাদের ভট্টপল্লীর গৌরব, আমাদের আপনার জন। "গেঁয়ো যুগী ভিখ্ পায় না" এই প্রবাদটাকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা তাঁকে এই পদে বরণ ক'রে আজ নিজেদের ধন্য জ্ঞান কর্‌ছি। ইতিহাস-শাখার সভাপতি তরুণ নরেন্দ্রনাথকে আমি সাদরে আহ্বান কর্‌ছি। লক্ষ্মী সরস্বতীর ঝগ্‌ড়া তাঁতে এসে মিটে গেছে। তাঁহার আদিম নিবাস চুঁচুড়ায়। নৈহাটী চুঁচুড়ার আড়পার। নৈহাটীর তাঁর উপর একটা দাবী আছে। সেই দাবীর জোরেই আজ তাঁকে আহ্বান কর্‌ছি। হে পূজনীয় জগদানন্দ, ৺রামেন্দ্রসুন্দরের পদানুসরণে বিজ্ঞানের নানাবিষয়িণী তত্ত্বালোচনা ক'রে আপনি বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছেন। আমি আপনাকে সাদরে এই সভার বিজ্ঞানের সভাপতিত্বে বরণ কর্‌ছি; "গ্রহ-নক্ষত্রে" অজ্ঞানদের দ্যুলোক দেখিয়েছেন, এইবার ভূলোক দেখিয়ে ধন্য করুন—এই প্রার্থনা।

আমাদের পরম আনন্দের বিষয় যে, জগৎপূজ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত হ'য়ে এই সভার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর বিষয়ে আমার কিছু বল্‌বার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তিনি এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্বোধয়িতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রিয়পাত্র। তাঁহার উপস্থিতি বঙ্কিম-পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

আমি নিজে পুরাতন, তাই আমার পুরাতনের উপর একটা প্রীতি আছে। সবচেয়ে ভাল লাগে পুরাতন চাল আর পুরাতন গ্রাম। হালিসহর, নৈহাটী,

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর

ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া, শ্যামনগর খুব পুরাতন গ্রাম, সুতরাং আমার বড়ই প্রিয়। খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীতে ত্রিবেণীবাসী মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে গৌরীয়ার পাটের কথা আছে, গরিফা, 'গৌরীয়ার পাট' কথার অপভ্রংশ—চৈতন্যদেবের এক নাম গৌড়ীয়। এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান আড্ডা ছিল ব'লে এই স্থানের নাম গৌরীয়ার পাট হ'য়েছে। সাতগাঁ ছেড়ে যখন মুসলমান শাসনকর্ত্তারা ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে নূতন আড্ডা করেন, নৈহাটী প্রভৃতির অভ্যুত্থান সেই সময় হইতেই হয়। রাজকার্য্যোপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সেই সময়ে নৈহাটীতে এসে বসবাস করেন। মুসলমান বাসিন্দাও অনেকে আসেন। আমার ছেলেবেলায়ও গঙ্গার তীরে বহু মুসলমানের বাস দেখেছি। জানমামুদ ঘাট-রোড এখানকার মুসলমান প্রতিপত্তির শেষ চিহ্ন।

গঙ্গা ও পদ্মানদীর মাঝখানে যে 'ব' কারের মত জায়গাটী আছে, হাজার বছর পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল ব্রাহ্মতটী। ব্রাহ্মতটী চলিত ভাষায় বাগড়ী হইয়া দাঁড়ায়। মুর্শিদাবাদের লোক এখনও ঐ নগর হইতে পশ্চিম অঞ্চলকে রাঢ় ও পূর্ব্ব অঞ্চলকে বাগড়ী বলে। বল্লালসেনের সময় সমস্ত ব-দ্বীপটাকে বাগড়ী বলিত। গঙ্গার পূর্ব্বধারে বরাবরই ছাপঘাটীর মোহনা হইতে সাগর পর্য্যন্ত বল্লালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কারণ, রাণাঘাটের নিকট আন্দুল ও হরিনাভির নিকট গোবিন্দপুরের সেনরাজগণের রাজত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

সতের জন ঘোড়সওয়ার লইয়া বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালাদেশটা জয় করেন, এই কথাটা এখন গল্প সল্প বলিয়াই লোকে মনে করে। মুসলমানদিগকে টুকি টুকি করিয়া অনেক দিনে সারা বাঙ্গালা জয় করিতে হ'য়েছিল। বল্লালের অধীন রাজারা সহজে মুসলমানদিগকে আমল দেন নাই। আমাদের এ অঞ্চলে সাতগাঁ তখন খুব বড় সহর। সাতগাঁ জয় করিতে মুসলমানদিগের প্রায় ১০০ বৎসর লেগেছিল। ১২৯৬ খৃষ্ট সনে জাফর খাঁ সাতগাঁ জয় করেন, তাঁহার মসজীদ এখন দয়ারখাঁর মসজীদ ব'লে বিখ্যাত। সেখানে এক কুড়ুল আছে, তাহার নাম গাজীর কুড়ুল—নড়ে চড়ে পড়ে না।

১৩০০ হইতে ১৪০০ পর্য্যন্ত একশত বছরে সারা বাঙ্গালা প্রায় মুসলমানদিগের অধীন হয়। ইং ১৩২৫ সালে বাঙ্গালায় তিনটী রাজত্ব হয়—সাতগাঁ, সোনারগাঁ ও

গৌড়। ১৩২৫ সালে তিনটি বাঙ্গালা এক হ'য়ে দিল্লী হইতে পৃথক্ হয়। কিন্তু সাতগাঁয়ে একজন মালীক থাকে।

১৪০১ সালে রাজা গণেশ মুসলমানদিগকে হারাইয়া দিয়া বাঙ্গালায় বাঙ্গালী রাজত্বের সৃষ্টি করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান হইয়া গেলেও বাঙ্গালী মতে রাজত্বটা বহুকাল ধরিয়া চলে। ১৪০০ হইতে ১৫০০র মধ্যে একঘর কায়স্থ পূর্ব্ব-মালিকদিগকে তাড়াইয়া সাতগাঁ রাজ্যটী দখল করেন। তাঁহার রাজ্যের আয় ছিল ২০ লক্ষ টাকা। ১৪৯৪ সালে আলাউদ্দীন হুসেন সা বাঙ্গালার সুলতান হ'য়ে বন্দোবস্ত করেন যে, সাতগাঁর রাজারা দুই ভাই—হিরণ্য আর গোবর্দ্ধন ১২ লাখ টাকা কর দিবেন, এক লাখ টাকা পূর্ব্ব মালিকদের দিবেন আর সাত লাখ টাকা নিজেরা ভোগ করবেন। এই হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন ও চৈতন্যদেবের বিবাহের সমস্ত খরচ দিয়াছিলেন। ইঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী রঘুনাথ, কিন্তু তিনিও রাজ্য ছাড়িয়া চৈতন্যের মত সন্ন্যাসী হ'য়ে যান এবং প্রথমে পুরীতে তারপর বৃন্দাবনে বাস করেন। তাঁর পৈতৃক রাজত্ব চাঁদখাঁর জায়গীর হ'য়ে যায়। এই সময়ে পর্ত্তুগীজরা বাঙ্গালায় আসে এবং এই অঞ্চলের নাম রাখে চণ্ডিকান অর্থাৎ চাঁদখাঁর জায়গীর। এই জায়গীর যমুনা হইতে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙ্গালাদেশে সে সময়ে যে সকল উত্তরাধিকারী ছিলেন, তাঁহারা চাঁদখাঁর জায়গীর শ্রীহরি রায়কে দিয়েছিলেন। শ্রীহরি রায়ের আর এক নাম বিক্রমাদিত্য। ইঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য ও ভ্রাতা বসন্ত রায়। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের অংশ চাঁচড়ার রাজাদের দিয়া যান এবং তাঁহাদের নাম হয় ২৪ পরগণার রাজা। ক্রমে ক্রমে অনেক পরগণা তাঁহাদের হাত থেকে সরে যায়। নদীয়ার রাজারা ইংরেজের প্রথম আমলে এ অঞ্চলের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

প্রতাপাদিত্যের সময় হইতেই নৈহাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গরিফার প্রসিদ্ধি হয়। তাহারও একশত বৎসর পূর্ব্বে ভাটপাড়ার নাম পাওয়া যায়।

সাহিত্যের অনুশাসন মেনে অভিভাষণ লেখা আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। আমার উপর এর চেয়ে যদি মিউনিসিপ্যালিটীর খবর দেবার হুকুম হ'তো, তা হ'লে এক নিশ্বাসে আপনাদের শুনিয়ে দিতে পারতুম যে, পূর্ব্বোক্ত পাঁচখানি গ্রামই পূর্ব্বে

এক মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন ছিল। এক্ষণে অধীন তাহার যে পদে আসীন, একদিন পূজ্যপাদ ৺বঙ্কিমচন্দ্র ও তারপর তাঁর শিষ্য আমাদের বর্ত্তমান গৌরব শাস্ত্রী মহাশয় সেই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন—৺বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺পূর্ণচন্দ্র এই মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান হ'য়েছিলেন। ১৮৮৩ সালে সংস্কৃত টোলের সাহায্যার্থ মিউনিসিপ্যালিটী হইতে টাকা দেওয়া হয় এবং আরও যদি চান, তা'হলে তার জনসংখ্যা, আয়, ব্যয় ও উন্নতির ইতিহাস, সবই শুনিয়ে দিতে পারি; কিন্তু সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনায় সেগুলি শিবের গীত গাইতে এসে ধান ভানা হবে; শাস্ত্রী মহাশয় ঢেঁকিকে জোর ক'রে স্বর্গে তুলেছেন বটে, কিন্তু সে তাহার ধান-ভানা-বৃত্তি ছাড়তে পারে কই? ঢেঁকির কথা যখন আরম্ভ করেছি, তখন শেষ করি। আমাদের আয়োজন অল্প কিন্তু আমরা ঢেঁকি-বাহনের নিমন্ত্রণ করে বসে আছি। আমরা করযোড়ে আপনাদের নিবেদন করছি যে, নিজগুণে সব দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করে' আপনারা আমাদের আতিথ্যে সন্তুষ্ট হ'ন।

অনেক সময় দেখেছি, যখন কোন কোন উকীল হালে পানি পান না এবং মোকদ্দমা যায় যায় হয়, সেই সময় শোনা-কথা প্রমাণ বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। অন্য সময় সে কাজে দারুণ আপত্তি থাকলেও, আমার আজকে সেই পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ বলে মনে হচ্ছে। তাই স্থির কচ্ছি যে, পাদপূরণের জন্য "চ বা তু হি"র ন্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে শোনা দেশের অতীত কাহিনীগুলি আপনাদের কাছে উপস্থিত করব। কিন্তু বিপদ হয়েছে ভাষা নিয়ে। সে সকল গুরু-গম্ভীর কাহিনী বিবৃত করতে হ'লে, যে গম্ভীর লেখনী চাই, তার জন্য আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গনারী'র কেদারের মত বুক চাপড়ে ভদ্র হ'বার ব্যর্থ চেষ্টা করতে হবে। অতীতের কথা—আমাদের গৌরবের কথা; সেগুলি বড়ই মিষ্ট, তাই "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই নীতির অনুসরণ করে আমি সেগুলি মুলতুবি রেখে প্রথমে আপনাদের একটু ঘরের খবর দিই।

এখন আমাদের অবস্থা কুমারসম্ভবের গৌরীর মত 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—ভাব, আমরা না গ্রামবাসী, না সহরবাসী; এই খিচুড়ির মুখোস পরে আমরা খুব ভাল নাই। এখন এখানে কল-কারখানা খুব বেড়েছে। হিতোপদেশে পড়ার মত নানা দিগ্‌দেশ হতে নানা মানুষ কুঠীতে চাকরির জন্য এখানে এসে বসবাস

কর্‌ছে। সব পরিবর্ত্তনের মত এ পরিবর্ত্তনেরও ভাল মন্দ দুই দিক আছে। কুঠীর কল্যাণে এখানে অধিক অর্থাগম হচ্ছে—লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল হয়েছে—মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে—রাস্তায় রাস্তায় কলের জল হয়েছে, ঘরে ঘরে কলের জল শীঘ্র হবে এবং ক্রমে ঘরে ঘরে বিজলী বাতি জ্বল্‌বে ও পাখা চল্‌বে, আশা করা যায়। অপর দিকে কুঠী সর্ব্বোচ্চ ডাকে এত বেশী দর দিয়ে এত বেশী জমি গ্রাস করেছে যে, স্থানীয় লোকের বাসের জমিও দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠেছে। কুঠীর বেশী মাহিনা ছেড়ে' গৃহস্থের বাড়ীতে চাকুরি করবার ঝি-চাকর পাওয়া যায় না; ৺জগন্নাথ দেবের কৃপায় তাঁর দেশবাসী মাত্র দু'চার জন অনুগ্রহপূর্ব্বক ভদ্রলোকের মান বজায়ের সহায়তা কর্‌ছেন। মাতা সরস্বতী ঠাকরুণের উপর ভক্তি ভাঁটায় এত নেমে গেছে যে, ভদ্রগৃহে তাঁহার স্থান নাই। তাঁর পীঠে এখন কুবেরের পূজা চল্‌ছে; এবং আবশ্যক অনাবশ্যক সময়ে কলের কুলীরা নিশীথ-রাত্রে গৃহস্থের ঘরের দেওয়ালের উপর আপন কারিগরি দেখিয়ে তা'দের অর্থাধারের ভার লাঘব ক'রে থাকে; এমন কি শিশু-গণের জন্য সঞ্চিত আমসত্ত্বের হাঁড়িও তাহাদের হাতে ত্রাণ পায় না। আপনারা যখন অনুগ্রহ ক'রে এখানে এসেছেন, তখন আমার সব কথা আপনাদের সাব-ধানের জন্য বলা উচিত। তবে আশা করা যায় যে, লঘ্বঙ্গুলিবিশিষ্ট ভ্রাতৃবৃন্দ আপনাদের উপর নিজ নিজ অঙ্গুলের লঘুতা পরীক্ষা করে' আতিথেয়তার অবমাননা কর্‌বে না।

এই স্থানটী বাঙ্গালার অতীত ইতিহাসের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত। আমার মনে হয়, সাহিত্যের পক্ষে এই স্থানটী কল্পতরুবিশেষ। অর্থাৎ সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের চর্চ্চার মালমসলা প্রভূতপরিমাণে এখানে জমা আছে। কুমারহট্ট হ'তে কাঁকনাড়ার পথে এই ভাগীরথীর বুকে সপ্তডিঙ্গা ভাসিয়ে দিয়ে একদিন শ্রীমন্ত ভেসে গিয়েছিলেন। কলিকাতা অবরোধের সময় বাঙ্গালীসেনার শেষ বিজয়বাহিনী ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এইখানে গঙ্গাপার হ'য়ে রথডাঙ্গার মাঠে ছাউনি ফেলেছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একদিন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী কুমারহট্টে (হালিসহর) শ্রীবাসের অঙ্গনে অবস্থান ক'রেছিলেন এবং তাঁর পুষ্করিণীতে স্নান ক'রেছিলেন। মহাপ্রভুর অন্যতম শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য্য আমাদের গরিফার কন্দর্প সেনকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কন্দর্প সেনের সমাধি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কন্দর্প সেনের বংশে বাঙ্গালার প্রথম অভিধানকার দেওয়ান রামকমল সেন জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গালার সাধক-কবি রামপ্রসাদের জন্মস্থান এই হালিসহরে। তাঁহার বিষয়ে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। "চাহার দরবেশ" বা "বাকবাহার", "গোলেবকাওয়ালি" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পারস্য কাব্যের অনুবাদক ৺প্রাণকৃষ্ণ মিত্রের বাসস্থানও এইখানে। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রপিতামহ মহাপণ্ডিত মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ নৈহাটীতে টোল ক'রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান করিতেন। তাঁ'র হাতের লেখা পুঁথি শাস্ত্রী মহাশয়ের ঘরে আমাদের দেশের পূজার সামগ্রী হ'য়ে আছে। এর পরই ভাটপাড়ার অভ্যুত্থান হয়। ভাটপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি ও রাখালদাস ন্যায়রত্ন প্রভৃতির নাম দেশবিদিত। শাস্ত্রী মহাশয় যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার রামকমল ন্যায়রত্ন সেই বংশ উজ্জ্বল করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার অল্প বয়সেই দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক হয়েছিলেন। এই যা-কিছু আমাদের দেশের অতি পুরাতন খবর দিলাম। আমার সানুনয় নিবেদন, সে বিষয়ে বিশদভাবে জান্‌বার জন্য আমায় যেন কেহ বেশী জেরা না করেন; কারণ, এগুলি আমার পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হতে ভিক্ষালব্ধ-সামগ্রী। ঝুলি ঝেড়ে দিয়ে দিয়েছি। যদি বিশ্বাস না করেন, তা হ'লে আমাকেও বেসুরে বল্‌তে হবে—"আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে।"

শ্রুতি থেকে এবার স্মৃতিতে আসা যাক্। গরিফার রামকমল সেনের বংশে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম হয়। তাঁর মত বক্তা সে যুগে অতি অল্পই ছিল। তাঁর খ্যাতি ভারত অতিক্রম ক'রে ইউরোপে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর লেখা 'সেবকের নিবেদন' এত সরল ও সুন্দর যে, আমার মত লোকেরও হৃদয় হরণ করে। কেশবচন্দ্রের বিধানেই ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের আবির্ভাব।

আপনাদের ও আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র এই কাঁঠালপাড়ার লোক। তাঁর নামে যেন একটা মোহ আছে। আমার মত লোকও তাঁর বই পড়্‌লে সাহিত্যিক হ'বার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। তবে বিপদ এই যে, আমার মত অ-সাহিত্যিকের তাঁর লেখার বিষয় মতামত প্রকাশ করবার 'জুষ্টিকেশান্ নেই'। জানি যে, আমার মত অধিকারের অভাবে জাহির করা একেবারেই অশোভন, কিন্তু আমার তো থ'য়ে-বন্ধনে পড়ে আগাগোড়াই অনধিকার চর্চ্চা। তাই সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের

দানের বিষয় যদি কিছু বলি, সেটা আপনাদের পক্ষে বোঝার উপর শাকের আঁটির সমান হইবে মাত্র। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'তে রমণীয় প্রেমের কমনীয় চিত্র, 'মৃণালিনী'তে প্রেমের ও কর্ত্তব্যের সংগ্রাম, 'বিষবৃক্ষে' ধর্ম্মবিহীন শিক্ষার উপর পার্থিব রূপের প্রভাব, 'কপালকুণ্ডলা'র স্বভাবের শিশুর সহিত সমাজ-পালিতের পার্থক্য, 'দেবীচৌধুরাণী'তে ভোগের মাঝে ত্যাগের সাধনা, 'রাজসিংহে' আদর্শ রাজপুত-চরিত্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও দৃঢ়তা, 'আনন্দমঠে' আদর্শ মাতৃভূমির সেবা, 'সীতারামে' বাঙ্গালীর বল ও বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা, 'রজনী'তে বাহ্যদৃষ্টিহীন অন্ধের ও তাহার সঙ্গিগণের অন্তর্মুখী আত্ম-বিশ্লেষণ, 'চন্দ্রশেখরে'র সংযমেই প্রেমের গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একদিন এইখানেই তাঁর 'কমলাকান্তে' চটুলচাপল্যের সাথে জ্ঞান ও চিন্তার সংমিশ্রণ, 'বিবিধ প্রবন্ধে,' 'অনুশীলনে' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে' অতুলনীয় বিচার ও চিন্তাশক্তির সমন্বয় এবং 'গীতা'র টীকার সুগভীর দর্শনতত্ত্ব সমগ্র বাঙ্গালীকে স্তম্ভিত করেছিল। আজিকার এই সম্মিলন তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে দেওয়া অর্ঘ্য মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রের বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে দান নেহাৎ সামান্য নয়।

এই স্থান বর্ত্তমান যুগের অনেক মনীষীর আদি বাসস্থান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এইস্থানে অনেকদিন বাস করেছেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রায় রাঁইয়া রঘুরাম মিত্র, বেহারি-লাল গুপ্ত, কারতারক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা তারকচন্দ্র সরকার, তৎপুত্র নলিনবিহারী সরকার ও লেফটেনাণ্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের দেশের গৌরব। ইঁহাদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ এখনও জীবিত।

ভৌতিক গল্প হয় ত আপনারা কল্পনার বলে অনেক লিখে থাকেন। যিনি সেই ভূতকুলের পরম ভীতির কারণ ছিলেন এবং যাঁর হুকুম ভূতপেত্নী হেটমুণ্ডে মান্‌ত, সেই 'গঙ্গা ময়রা'র জন্ম এই গ্রামে। তাঁরি এক বংশধর সুরেন্দ্রনাথ আমাদের অভ্যর্থনা-সমিতির একজন সভ্য। তাঁকে আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে আপনাদের পরিচর্য্যার জন্য ভূত স্বেচ্ছাসেবকের একদল গঠন করিতে অনুরোধ করেছিলাম। তাঁদের লম্বা লম্বা হাত পায়ের গুণে হুকুমমাত্র আপনারা সব জিনিষই পেতেন। তিনি তাতে রাজি হননি। দিনের আলোয়

কার্য্যভার ত তিনি নিলেন না। জানি না, রাত্রের আঁধারে তিনি এইরূপ দল আপনাদের সেবার জন্য—হঠাৎ পাঠিয়ে দেবেন কি না!

এইবার আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাথার মণির কথা বল্‌ব। হরের প্রসাদে হরপ্রসাদকে পেয়ে আমরা ধন্য। বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভারতের অতীত ইতিহাসের তত্ত্বালোচনায় তিনি যে এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, তার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি ৺বঙ্কিমচন্দ্রের একজন শিষ্য, আজ তাঁর বৃদ্ধবয়সে তিনি তাঁর গুরুদেবের স্মৃতির প্রতি অর্ঘ্য প্রদানের জন্য আপনাদের এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে' এনেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'ক এবং তিনি দীর্ঘজীবী হ'য়ে বঙ্গসাহিত্য ও নৈহাটীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন কর্‌তে থাকুন। তাঁর দেশসেবার প্রত্যক্ষ ফল নৈহাটী মহেন্দ্র হাই স্কুল। শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টা ও ব্যয়ে এই বিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচশত ছাত্র জ্ঞানের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির কথা যখন উঠ্‌ল, তখন আমার বলা উচিত যে, আমরা তাঁর জন্য কিছুই কর্‌তে পারিনি। মিউনিসিপ্যালিটী থেকে মাত্র বঙ্কিমরোড নামে একটী রাস্তার নামকরণ হয়েছে এবং সাধারণের জন্য মিত্রপাড়ায় 'বঙ্কিম-পাঠাগার' নামে একটী পুস্তকাগার সবে মাত্র খোলা হয়েছে। যদি অনুগ্রহ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা বলে' সেখানে কেউ যান, তাহলে সে চেষ্টা কত দীনহীন তা নিজচক্ষে দেখে আস্‌তে পার্‌বেন।

আর একজনের কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, তিনি আপনাদের ও আমাদের সকলের সুপরিচিত বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়। এই সম্মিলনের জন্য তিনি দিনরাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার পরিশ্রম ও কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া সাহিত্য-পরিষদের ও সাহিত্য-সম্মিলনের পরলোকগত সেবক ব্যোমকেশ মুস্তফীর কথা মনে পড়িতেছে। পরিষদ্-সরোবরের নলিনী আজ শতদলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের এই চারি গাঁয়ে ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত চর্চ্চা কর্‌তেন। কায়স্থেরা পার্শী চর্চ্চা কর্‌তেন এবং বৈদ্যেরা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা দু'এরই চর্চ্চা কর্‌তেন। ছোটবেলায় শুনেছি আমাদের সদরবাটীর একটী ঘর মেয়েমহলে 'মক্তক' ব'লে পরিচিত হ'ত। এখন বুঝ্‌তে পারা গেছে, সেই মক্তক মক্তাবেরই অপভ্রংশ। সেই ঘরে যে পার্শী চর্চ্চার মক্তাব ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, এখনও দু'একজন জীবিত আছেন, যাঁহারা বলেন যে, ৺বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র

সেই মক্তাবে পার্সী শিখ্‌তে আস্‌তেন। এখন সবাই টটামিটি ইংরাজী পড়ে এবং রেল, কল ও কলিকাতার সওদাগরী অফিসে চাকরী ক'রে দিননির্ব্বাহ করে। অনেক কোটি ইংরাজের মূলধন এখানে আসিয়া পড়ায়, বহুসংখ্যক কলকারখানা হওয়ায়, এখানকার অন্নকষ্ট বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চল হইতে অপেক্ষাকৃত কম। আর্থিক উন্নতি একটু একটু কেবল এইখানে দেখা যায়। এখানে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন করার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদের মন যেন বাঙ্গালা-সাহিত্যের দিকে ফেরে, অন্যদিকে মন না দিয়া ইহারা যেন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। আপনাদের আগমনে আমাদের এই দিকে মন ফিরিলে, ইহার ভবিষ্যৎ ফল বড়ই ভাল হ'বে।

আমাদের অতীতের কথা বলেছি, বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়েছি, বাকী আছে ভবিষ্যৎ—সেটা আপনাদের হাতে। যদিও আমার কণ্ঠে সুর নাই,—দেহে বল নাই, প্রাণে সে সজীবতা নাই, চক্ষুর জ্যোতিঃ নাই তথাপি আমার ক্ষুদ্র শক্তি একত্র করে' আমি আপনাদের নিকট কয়খানি গ্রামবাসীদিগের পক্ষ থেকে আকুল নিবেদন করছি যে, আপনারা এখানে সভাসীন হয়ে, আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন, আমাদের প্রাণে নবভাব জাগান, যেন আমরা আবার মানুষ হই—বঙ্কিমের গ্রামবাসী ব'লে পরিচয় দিতে পারি। বন্দে মাতরম্‌।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন

সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি

মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যর বিজয়চন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুর

সভাপতির অভিভাষণ

সমবেত সভ্য সাহিত্যিকবৃন্দ—

সাহিত্য-সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত—এত মহান্ যে সঙ্গীতে, প্রবন্ধে, অভিভাষণে লেখনী দ্বারা, তাম্র-শাসনে, প্রস্তর-ফলকাদি দ্বারা দেশবিদেশে, যুগ যুগান্তরে কেবল তাহারই অনন্ত কাহিনী ঘোষিত হয়। সে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য কোনও মানবের পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নয়, এমন কি তাহার কোনও ক্ষুদ্র বিভাগেও পূর্ণ অধিকার যে কোনও মানবের জীবনব্যাপী আয়াসসাধ্য—সে কঠোর সাধনার পথে পাদমাত্র অগ্রসর হইয়া সিদ্ধি করতলগত কল্পনা করা আরব্যো-পন্যাসের আবুহোসেনের হঠাৎ বাদসাহীর ন্যায় বাতুলতা ভিন্ন কিছু নহে, ইহা জানি ও বুঝি বলিয়াই এই চতুর্দ্দশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ যখন আমার নিকট আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থাপিত করেন, তখন আমি প্রথমে এই সম্মান গ্রহণ করিতে আদৌ ইচ্ছুক হই নাই এবং ইহাই আমার ইতিপূর্ব্বেও আর একবার এই মহাসম্মান গ্রহণ করিবার অন্তরায়স্বরূপ হইয়াছিল। আপনারা হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও আমি পূর্ব্বাচরিত পন্থা অবলম্বন করিলাম না কেন? ইহার তিনটী কারণ আছে। প্রথমতঃ শাস্ত্রী-মহাশয়ের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারা, দ্বিতীয়তঃ ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণ মহোদয়-গণের শুভদর্শন লাভের সুযোগ ত্যাগ করিতে না পারা এবং তৃতীয়তঃ স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাটা সভ্যতাবিরুদ্ধ, ইহা বিবেচনা করা। ইহা ব্যতীত আরও একটা প্রধান কারণ আছে, যে জন্য আজ আমি আপনাদের নিকট এইরূপ আসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। সাহিত্য-সম্মিলনীর যিনি প্রধান সভাপতি হইবেন, তিনি একজন মহান্ বিদ্যাদিগ্‌গজ সাহিত্যিক না হইয়া যদি আমার ন্যায় ক্ষুদ্র সাহিত্যসেবীও না হইতেন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?—ক্ষতি কার? যাহার প্রাণে সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ আছে—সাহিত্য-সেবা যার নিত্যকর্ম্ম—সাহিত্য-সেবীর সমাদর করা যে অবশ্য

পালনীয় কর্ত্তব্যস্বরূপ জ্ঞান করে—সাহিত্য-সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রজা হইলেও—বাণীমন্দিরের এক অতি দীন পরিচারক হইলেও—একনিষ্ঠ সাধনা ও প্রগাঢ়ভক্তিগুণে সেও একদিন পৌরোহিত্যে আহূত হইতে পারে। মাতৃপূজা কেহ ষোড়শোপচারে সম্পন্ন করেন, কেহবা "থোড়ের নৈবেদ্যও" মার চরণে ভক্তি-ভরে নিবেদন করে, মা তো একটী গ্রহণ করিয়া, তুচ্ছ বলিয়া অপরটী ত্যাগ করেন না; তবে পূজারীর এত বাছাবাছির অর্থ কি? দীন যদি মার চরণে তার সযত্ন-সঞ্চিত পূজা-সম্ভার লইয়া যায়, ধনীর দম্ভ অভিমান তাহার থাকে না; নিজের দৈন্য মনে মনে উপলব্ধি করিয়া ভক্তির দ্বারা উপকরণের অভাব পূর্ণ করিয়া সম্ভ্রম-নতশিরে সে মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করে—জননী তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন না, এ কথা কে বলিবে? ক্ষুদ্র একাগ্র সাহিত্য-সেবী সমাদৃত বা সম্মানিত হইলে নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব না হইয়া নিজ সাধ্যানুসারে পূজার আয়োজন মাত্র করিয়া দিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করে। গীতার সেই মহাবাক্যই তখন তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

এই সকল নানা কারণ ভাবিয়া চিন্তিয়াই আমি আজ আপনাদের এই সভায় সভাপতিত্ব স্বীকারে অগ্রসর হইয়াছি। এই সম্মিলনীর মুখরক্ষা করিবেন শাখা-সভাপতিগণ; কেন না তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ, কৃতবিদ্য, লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং সাহিত্য-সমাজের পরম আদরের সামগ্রী; আমি কেবল আপনাদের প্রতিভূস্বরূপ ছোট বড় যে যে স্থান হইতে যে যে সাহিত্যসেবী উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথোচিত পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বাগ্‌দেবী-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে অভ্যর্থনা করিব মাত্র। এই কার্য্য যে সাহিত্যিক-গবেষণা অপেক্ষা কোনও অংশে ক্ষুদ্র, তাহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। এই উদ্বোধনের পর আমার যাহা কিছু সামান্য কথা বলিবার আছে, তাহা অতি সংক্ষেপেই আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি,—গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান, আপনাদের বিবেচনাধীন। তবে প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমি নিজের অভিভাষণে বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা বা সাহিত্যিকগণের ভাব বা ভাষার প্রবাহ সম্বন্ধে কিছুই বলিব না—চিরন্তন প্রথার বশবর্ত্তী হইতে গেলে হয় ত অনেকেই সভাপতির অভিভাষণে এইরূপ প্রসঙ্গ একটা অপরিহার্য্য অংশস্বরূপ গণ্য করিতে পারেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এই নীতি অবলম্বন না করিয়া সমালোচকের কণ্টকময় আসন ত্যাগ করিতেছি। এরূপ আলোচনা সম্মিলনের সভাপতি হিসাবে আমার পক্ষে সমীচীন হইবে কি না, ইহা বিচার করিতে চাহি না—এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, তাহা আমার প্রাণের মত হইবে না, সুতরাং আশা করি, ব্যক্তিগত প্রকৃতি-বৈষম্য উপলব্ধি করিয়া আপনারা আমার এ ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন।

একটা কথা আপনাদের বিচারার্থে নিবেদন করা আমি একান্তই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আমার মনে হয়, এ কথার অন্তর্নিহিত সত্য আপনারা সকলেই নিজ নিজ অন্তরে স্পষ্ট অনুভব করেন, কিন্তু ইহার সাফল্য সাধনে অদ্যাপি বিশেষ কোনও চেষ্টা হইয়াছে কিনা, জানি না। এইরূপ বাৎসরিক সম্মিলন সজাগ রাখাই যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণকে সজীব করাই যদি আমাদের জপ, তপ, ব্রত হয়, তবে যাহাতে তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা করিতে হইলে বাৎসরিক সম্মিলনীতে কেবল সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধাদি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া কেবল সম্মিলনের অধিবেশনের ক্রিয়াকলাপ মুদ্রিত করতঃ বৎসরাবধিকাল একরূপ নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা—বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রকৃত উচ্চসিংহাসনে বসাইবার জন্য—সাহিত্যক্ষেত্রের চূড়ামণিগণকে সম্মানিত করিয়া জনসাধারণের মনোযোগ তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা—অনুসন্ধানপূর্ব্বক স্থির করিতে হইবে। বর্দ্ধমানে যখন অষ্টম সাহিত্য-সম্মিলন হয়, তখন আমি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়াছিলাম, তাহাতে এই বিষয়েই ইঙ্গিত ছিল। অদ্য আপনাদের অনুমতি লইয়া এই বিষয়েই আমি কিছু বিশদভাবে বলিতে চাই। আমার অভিভাষণের মূল উদ্দেশ্য তাহাই জানিবেন। আমি চাই যে, আমাদের এই দরিদ্র দেশে Nobel Prizeএর মত সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য কোনও Prize বা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হইলেও, প্রতি বৎসর চারি সহস্র মুদ্রা পরিমিত বা তদ্রূপ কোনও পুরস্কারের আয়োজন করা নিতান্ত অসম্ভবপর হইবে না। এই পুরস্কার প্রয়োজনানুসারে চারি বা ততোধিক সাহিত্য-শাখায় বিভক্ত করা যাইতে

পারে। যথা—বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি। প্রত্যেক বৎসর যখন সম্মিলন হইবে, তখন একটী Executive Committee (কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি) সম্মিলনের পক্ষ হইতে গঠিত হইতে পারে এবং তদ্বৎসরের ঃ—

মূলসভার সভাপতি

শাখা-সভাপতিগণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্মিলন-পরিচালনের সভাপতি ও সম্পাদক এই সমিতির সদস্য হইতে পারেন। বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া লইয়া এই চারিটী শাখার চারিটী পুরস্কার কোন্ চারিজনকে দেওয়া হইবে, তাহা এই সমিতির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে। সম্মিলনের দ্বিতীয় দিবসে সম্মিলনের প্রধান সভাপতি এই পুরস্কার ঘোষণা করিবেন।

এইরূপ একটা উপায় উদ্ভাবন করিলে জনসাধারণকে দেখান হইবে যে, সম্মিলন প্রকৃতই সাহিত্যসেবিগণের সমাদর জন্য একটা উপায় করিয়াছেন। তাহার পর শাখা-সভাপতিগণের সমক্ষে যে সকল প্রবন্ধাদি পঠিত হয়, তন্মধ্যে প্রত্যেক শাখায় যে প্রবন্ধটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তাহা সম্মিলনের ব্যয়ে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে হইবে।

তারপর, বাঙ্গালা ভাষার বহুলপ্রচারকল্পে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার সমাদর বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে দেখিতে হইবে, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ পুস্তক ভাষান্তরিত করা বাঞ্ছনীয়। এই বিষয়ে আদান প্রদান কতদূর চলিতে পারে, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও উন্নতি অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহায্য ব্যতীত আমরা আমাদের মনোভাব স্পষ্ট ব্যক্ত করিতে পারি না বলিয়া মনে হয়, অতএব অন্য ভাষা হইতে শব্দ বা ভাব গ্রহণ করিয়া সময়ে সময়ে নিজ ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করা বাঞ্ছনীয় হয়। এ বিষয়ে নিতান্ত রক্ষণশীল মতাবলম্বন করা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু, মারাঠী, তামিলী, গুজরাটী, গুরুমুখী ভাষায় রচিত লোকমনোরম, পরম হিতকর গ্রন্থাবলীতে যে ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; বাঙ্গালা সাহিত্যের হরিতক্ষেত্রে তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিলে জাহ্নবী-জলপ্রবাহের ন্যায় তাহা বাঙ্গালার সম্পদ বর্দ্ধিত যে না করিবে, তাহা বলা যায় না। বিদেশীয় বা

বিজাতীয় দ্রব্যের মধ্যেও যদি শোভন কিছু, উপাদেয় কিছু, প্রয়োজনীয় কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা, শুধু "নিজস্ব নহে" এ জ্ঞানে বর্জ্জন করা প্রাজ্ঞোচিত নহে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার এরূপ রূপান্তর ও ভাবান্তর স্বতঃই সাধিত হয়; পরিষদের কর্ত্তব্য—সম্মিলনের কর্ত্তব্য, তাহার মন্থরগতি বেগসংযুক্ত করা এবং উচ্ছৃঙ্খল গতি রোধ করা। কিরূপে এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার ইঙ্গিত প্রদান করা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সাহিত্য-পরিষদ্ই তাহা অন্যান্য সাহিত্য-প্রচার-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে পারেন এবং এই বিষয়ে আমি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মোটামুটি আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল, তাহা বলিয়াছি—নূতন কথা আপনাদিগকে শুনাইবার আশায় আমি আসি নাই—আসিয়াছি সাধারণ সাহিত্যের উন্নতির জন্য, সাহিত্যসেবীর সমাদর জন্য—আপনাদিগকে কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিবার অনুরোধ করিতে।

এক্ষণে যে স্থানে আমরা সম্মিলিত হইয়াছি, সাহিত্যের সেই পুণ্যতীর্থে যে একজন মহাযশস্বী, পরম ভাবুক সুকবির স্মৃতি বিজড়িত আছে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম স্মরণ করিলেই প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়ে অতুলনীয় গৌরবের স্পন্দন জাগিয়া উঠে—সেই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে আমি কৈশোরে যে সঙ্গীতটী রচনা করিয়াছিলাম, তাহা আমার অভিভাষণের অব্যবহিত পরেই গীত হইলে, আমি নিজকে ধন্য জ্ঞান করিব। এক্ষণে আসুন আমরা নিখিলচৈতন্যরূপিণী, অমল-ধবলজ্যোতির্ম্ময়ী, বেদমাতা বাগ্দেবীর উদ্দেশে—সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা, সুস্মিতা, ভূষিতা বঙ্গজননীর উদ্দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যানন্দের সুরে প্রাণ ভরিয়া ডাকি—

"বন্দে মাতরম্"।

শ্রীবিজয়চন্দ্ মহ্তাব

সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীনারায়ণ আজ আমাদিগের এই সারস্বতযজ্ঞে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইয়া বেদী ও মণ্ডপ রক্ষা করুন। যেন এই যজ্ঞ উৎপাত-রহিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, এই যজ্ঞ যাহাতে শুভপ্রদ, শান্তিপ্রদ, জ্ঞানপ্রদ হয়. হে মঙ্গলময় হরি তুমি তাহাই কর! বিদ্যার আলোচনা যাহাতে আমাদের লোচন-পথে গোলোকের আলোক উদ্ভাসিত করিয়া অবিদ্যারূপ অন্ধতা নষ্ট করে হে গোলোক-বিহারি, তুমি তাহাই কর।

শুভ্রশতদলবাসিনী সুহাসিনী সুভাষিণী বাগ্‌বাদিনী দেবী সরস্বতি, তোমার অভয়প্রদ চরণকমলে আমি বার বার প্রণাম করি। মা, তুমি আজ এইখানে আমার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হও। মা, শুনিয়াছি—তুমি মূককে বাচাল কর—কিন্তু রসনায় আসীনা হইয়া নীলনয়নে একটু খরদৃষ্টি রাখিও, মা, যেন আমি অধিক বাচাল বা বেচাল না হইয়া যাই। যেন মা, আমার স্মরণ থাকে, আমি কামার-বাড়ীতে সূচ বেচিতে আসিয়াছি, যেন মা, ভুলিয়া না যাই যে, আমি শিক্ষা করিতে আসিয়াছি, শিক্ষা দিতে আসি নাই; যেন মা, মনে থাকে আজ এখানে আমার আহ্বান শুভ-শঙ্খবাদনের জন্য, একটিমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী ফুৎকারে মঙ্গলকার্য্যের সূচনামাত্র করাই আমার অধিকার;—বেণু-বীণা, সারঙ্গ সেতার, মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাদনক্ষম কলাবিদ্‌গণ এখানে অনেকেই উপস্থিত—পরস্পরকে প্রফুল্ল প্রমোদিত ও পরিতৃপ্ত করিবেন তাঁহারাই।

পঞ্চোত্তরপঞ্চাশৎ বৎসর গৃহাশ্রমে ব্রতধারী হইয়া নিত্যসাধনার অভিজ্ঞতায় এই উপলব্ধি লাভ করিয়াছি যে, দাস্যভাবে সাধনার জন্য দুইটিমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় আছে—এক শাস্ত্রোক্তমতে হনূমানের ভাবে নিমগ্ন হইয়া সাধনা, আর এক প্রাজাপত্যভাবে পতিরূপে সাধনা। দুর্ভাগ্য-ক্রমে আমার মর্কটবুদ্ধি পরিপুষ্ট হইয়া হনূমত্বলাভে সমর্থ হয় নাই সুতরাং "তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমলোচনঃ" মন্ত্রসাধনে জীবনে কি সিদ্ধিলাভ হইত, তাহা বুঝি নাই কিন্তু পতিত্বের সাধনায় বুঝিয়াছি যে, কৃষ্ণনামের ফল কৃষ্ণনাম—"তথাপি মম সর্ব্বস্বং গৃহিণী রক্তলোচনা।"

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন

সাহিত্য-শাখার সভাপতি

নাট্যাচার্য্য— শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলাসুধাকর

আপনারা কৃপা করিয়া আমাকে যে এই সাহিত্য-শাখার সভাপতিপদে বরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি এই সভার দাসত্বের অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। একমুঠা মোটা চাউলের ভাত, একখানা মোটা কাপড় সরবরাহ করিবার চেষ্টা করিব : তাহা গ্রহণ করিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন, অভিমান-অশ্রুবিসর্জ্জন—নিত্যকর্ম্ম যাহা করিতে হয় করিবেন, কিন্তু সভাসুন্দরী যদি অলঙ্কারের প্রত্যাশা করেন, তবে এখন হইতেই পত্যন্তর গ্রহণ করুন,—আমি নিষ্কৃতি পাই। সাহিত্যের সাতনর, কাব্যের কণ্ঠমালা, পদ্যের পদক, বিজ্ঞানের বেস্‌লেট্, উপন্যাসের উপলোজ্জ্বল বাজুবন্ধ, নাটকের নেক্‌লেস্, এমন কি মতামতের মাকড়ীটি পর্য্যন্ত দিবার ক্ষমতা আমার নাই ; চাটুবাদের চন্দ্রহার পরাইলেও পরাইতে পারিতাম ; কেন না ধারে মেলে কিন্তু ও অলঙ্কারখানি বোধ হয় বর্ত্তমানযুগে অশ্লীল।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য প্রায়ই ভক্তিরসাশ্রিত ও পদাবলীতে লিখিত সেগুলি আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি ; যাঁহাদের বাটীতে নিত্যসেবা আছে, তাহারা উহা কিছু কিছু প্রত্যহ ব্যবহার করেন, আমরা সাধারণ লোক—উহা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজাদি দেবকার্য্যোপলক্ষে ব্যবহার করি মাত্র। এ দেশে এমন এক দিন ছিল, যখন লোক দেবতাকে নিবেদন না করিয়া কোন দ্রব্যই গ্রহণ করিতেন না—ভোজ্যও নয়, পরিধেয়ও নয়, পাঠ্যগ্রন্থও নয়। উপাস্যের পূজা যে উঠিয়া গিয়াছে, এমন কথা আমি বলি না, তবে দেবতার নামপরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে ; সেকালের গ্রন্থকার গণেশবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, গুরুবন্দনা লিখিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেন, এখনকার বিদ্যালয়-পাঠ্য-পুস্তক-লেখকগণ কেহ কেহ রাজস্তোত্র, পরিদর্শকস্তোত্র লিখিয়া নিজের ও শিশু-ছাত্রদিগের ইহ-পরকালের পথ পরিষ্কার করেন, আর কাব্যাদির লেখকদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের রসসিক্ত পত্রাবলী উৎসর্গ করেন—কোনও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারীর নামে, অথবা উপাস্য দেবী "আমার মর্ম্মের মর্ম্ম সেই"—নামে!

এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে কয়খানি গ্রন্থ গদ্যে লিখিত হইয়াছিল, সে গদ্য জামাইঠকান খাদ্য। পূর্ব্বে পল্লীবাসী ললনাগণ যেমন নবাগত জামাতার সঙ্গে রসিকতা করিবার অভিপ্রায়ে কচুর কেশুর, বাঁশের আখ, কলার এঁটের ডাব, পিটুলির চন্দ্রপুলি, ডালবাটার ক্ষীরের ছাঁচ, খয়েরের কালজাম প্রভৃতি সুদর্শন খাদ্যসকল শিল্প-কৌশলের অপূর্ব্ব চাতুরী দেখাইয়া অতি যত্নে,

অতি পরিশ্রমে প্রস্তুত করিতেন অথচ গলাধঃকরণ করা দূরে থাক্, খাদ্য রসনাস্পর্শ করিবামাত্র জামাইবাবু "তিড়িং-লাফ" মারিয়া উঠিয়া পড়িতেন ও সময়ে সময়ে "গালফুলা গোবিন্দের মা" হইয়া যাইতেন; সেইরূপ গদ্যলেখকগণও বহু পরিশ্রমে, বহু যত্নে সংস্কৃত অভিধান ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া চোয়ালচূর্ণক্ষম দুরূহ শব্দসকল বাহির করিয়া তাহাতে মাঝে মাঝে পারসীর রক্তছিটা লাগাইয়া মহাশঙ্খের মালা গাঁথিতেন।

আজিকার এই শিষ্টগোষ্ঠীতে উপস্থিত হইয়া আমরা এক বিশাল তরুবরের ফল-ফুল-পত্র-শোভিত দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি বিবিধ শাখার পত্রচ্ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়াছি; যে শাখায় বসিয়া আমি এক্ষণে কলরব করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহার নাম "সাহিত্য-শাখা"। ক্ষুদ্রতম বিহঙ্গম আমি একটিমাত্র পত্রান্তরালে আম্রাতকপ্রমাণ কুলায়মধ্যে অনায়াসে আমার স্থানসঙ্কুলান হয়, কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার শক্তি আমার কোথায়? কিন্তু আপনারা পণ্ডিতমণ্ডলী দেখিতেছেন যে, যে মহান্ বৃক্ষ হইতে এই সকল শাখা উদ্গত হইয়াছে, তাহার নাম "জ্ঞান-বৃক্ষ"। জ্ঞানবৃক্ষের মূলোত্থিত রসসঞ্চার ভিন্ন কোনও শাখাই ফলপ্রদ হইতে পারে না, প্রাণিশ্রেষ্ঠ মানবজন্মলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐ বোধিবৃক্ষতলে বসিয়া সাধনা দ্বারা ভগবদ্‌জ্ঞানলাভে জীবাত্মাকে জাগরিত করা। নবজাত শিশু জন্মমাত্র ক্ষুধার উদ্রেকে একটিমাত্র স্তনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, পরে বাড়িতে বাড়িতে সে বোঝে যে তাহার একজন মা আছেন, ঐ স্তন তাঁহার অবয়বের একটি মঙ্গলপ্রদ অংশমাত্র; আর একটু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে যখন হাঁটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়, তখন সে গৃহের কোনও স্থান হইতে একটা মিষ্টান্ন বাহির করিয়া বলে, "আমি কেমন একটা সন্দেশ পেয়েছি"; আবার কোন স্থান হইতে একটা কাজললতা বাহির করিয়া বলে, "আমি কেমন একটা জিনিষ পেয়েছি"; আবার কোনও স্থান হইতে একটা খেল্‌না বাহির করিয়া বলে, "আমি কেমন একটা পুতুল পেয়েছি।" কিন্তু বুদ্ধির একটু বৃদ্ধির সহিতই শিশু বুঝিতে পারে যে, খেল্‌না, সন্দেশ, কাজললতা তাহার মা'র, মা তাহার জন্য বা অন্য ভাইবোনদের জন্য রাখিয়াছেন, সে হাতে করিয়া তুলিয়া আনিয়াছে মাত্র। এইরূপে সে যখন আধ-আধ স্বরে "মা বাবা দাদা কাকা—ঘটি বাটি কাপড় জামা—চাঁদ তারা বাতাস জল" প্রভৃতি কথা বলে, তখন না বুঝিলেও পরে বোঝে—সে তাহার

মায়ের কাছে শুনিয়া বা বাপের কাছে শুনিয়া ঐ সকল কথা শিখিয়াছে। মানবও সেইরূপ সাহিত্যের আলাপে, ইতিহাসের চর্চ্চায়, দর্শনের আলোচনায় শিশুর ন্যায় মনে মনে স্পর্দ্ধা করে যে, আমি কত বিদ্বান্ হইয়াছি; কিন্তু সাধনার সাহায্যে ভগবৎকৃপায় তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে সে বুঝিতে পারে যে, সেই অনন্তময়ের অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের এক আণুবীক্ষণিক অংশমাত্র তাহার আয়ত্ত। নিউটন্ যে বলিয়াছিলেন, তিনি অসীম সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্ষুদ্র কয়েকটি শিলাখণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বিনয়ের বশে নহে—জ্ঞানদৃষ্টিতে সৃষ্টিচাতুর্য্যের অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াই তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন। জড়-বিজ্ঞানে যাঁহারা মহামহোপাধ্যায়, তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায়, স্ব স্ব উদ্ভাবনী বা আবিষ্ক্রিয়াশক্তির বিকাশে তাঁহারা অহঙ্কৃত হয়েন না, বরং প্রকৃতিদেবীর অলোকসামান্যা শক্তির সমক্ষে নিজ নিজ মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া দেন। আমাদের দেশে বসুকুলোদ্ভব আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন; পরোলোকগত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের সহিত আলাপেও ঈশ্বরশক্তির অসীম মহত্ত্বের সম্মুখে বিজ্ঞানবিদ্‌কে মস্তক নত করিতে আমি বার বার দেখিয়াছি। কবি যদি সত্য কথা কহেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, মহান্ ভাব ও সুললিত পদাবলী তাঁহার রসনা হইতে কেমন করিয়া নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা নিজেই বুঝিতে পারেন না! "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ"—কালিদাসের বিনয় নহে, কবি-রাজ-রাজেশ্বরের সৃষ্টিরূপ মিষ্ট মহাকাব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি আপনাকে বামন বুঝিয়াছিলেন।

সেই ঈশজ্ঞানরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথম আমাদিগকে আত্মশুদ্ধি শিক্ষা করিতে হইবে—'অহং'কে বিসর্জ্জন দিয়া রিপু ও প্রবৃত্তিনিচয়কে সংযত করিয়া। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, অহঙ্কার, দুর্ব্বলদলনে আত্মপ্রাধান্যলাভের কামনা যাঁহাকে চাবুক মারিয়া ডাহিনে বামে ফিরাইতেছে, কুসুমকানন বিদলিত করিয়া কণ্টকারণ্যে ছুটাইতেছে—পথিপার্শ্বস্থ প্রণালীতে নিপাতিত করিতেছে, তিনি কেমন করিয়া আপনাকে জ্ঞানবান্ বলিয়া পরিচয় দেন? তিনি শব্দসারসংগ্রহপূর্ণ জীবন্ত অভিধান হইতে পারেন, তার্কিকরূপে দম দেওয়া কলের পুতুল হইতে পারেন, ভৌতিক দ্রব্যসংযোগে অজ্ঞানকে বিজ্ঞানের চমক দেখাইয়া

বাজীকর হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কখনই জ্ঞানবান্ নহেন। আর অর্থোপার্জ্জনকেই যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তাঁহারা পরিশ্রম করিয়া "ক খ" না শিখিয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠে বা শেয়ারের বাজারে যাতায়াত করিলেও হয় ত অধিকতর ফললাভ করিতে পারেন।

কালের দৌরাত্ম্যে আমাদের মধ্যে অনেক লৌকিক হিসাবে ভগবদ্‌বিশ্বাসী লোকও ভগবদ্‌ভক্তি, ভগবদ্‌জ্ঞান আলাদা করিয়া রাখিয়া সামাজিক, রাজনীতিক, শ্রমিক বা সাহিত্যিক কার্য্য পরিচালনা করিতে চেষ্টা করেন বলিয়াই আমার উক্ত কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে। যেমন সূর্য্যকে বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে রৌদ্রের সম্যক্ ধারণা হয় না, সেইরূপ ঈশজ্ঞানকে সরাইয়া রাখিলে কোনও বস্তুকেই প্রকৃত জ্ঞান নামে অভিহিত করা যায় না। ঈশ্বরোপাসনা কেবল ধ্যানে, পূজায়, স্তোত্রপাঠে বা তপস্যায়ই যে হয়, তাহা নহে; জাতির কল্যাণসাধন, জীবের দুঃখবিমোচন, সংসারে আনন্দদান, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে পবিত্র ও মধুময় করাই ঈশ্বরের কার্য্য; যিনি ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু এবং আপনাকে তাঁহার দাস মনে করিয়া—জগদীশ্বর যন্ত্রী, মানব যন্ত্রমাত্র—এই মনে করিয়া অনাসক্তভাবে কার্য্য করিতে পারেন, তিনি যে কার্য্যেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, সেই কার্য্য দ্বারাই ঈশ্বরের উপাসনা করেন। ঋষি তপস্যায়, যোগী ধ্যানে, ঋত্বিক্ যজ্ঞে, অধ্যাপক জ্ঞানদানে, কৃষক হলচালনে, গোপ গোপালনে ঈশ্বরেরই উপাসনা করে; ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছি মনে রাখিয়া সাহিত্যব্রতে ব্রতী হইলে আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয় না।

৫

বঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন—**সাহিত্য**। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বাঙ্গালার ভাণ্ডারে এখন যে সকল পুস্তক মজুত আছে, তাহার ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে ও শুদ্ধ সমালোচকের সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া অবশিষ্ট ও পরিষ্কৃত যাহা থাকে, তাহাকেও একটা সাহিত্য বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিতে পারি।

ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে বিদ্বজ্জনেরা যে তাঁহাদের মাতৃভাষাকে কি উদ্দীপনা-শক্তিতে, কি পদ-লালিত্যে, কি অর্থবোধে, কি শ্রুতিমাধুর্য্যে, কি ভাব-সম্ভারে, কি অলঙ্কারের সুষমায় অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এ কথা বলিলে অপর প্রদেশবাসিগণের ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ নাই; কেন না, যে

নারীর হৃদয় মাতৃভাবে পরিপূর্ণ, তিনি আপনার ছেলে পরের ছেলে বিচার করেন না, সকলের প্রতি তাঁহার সমান মাতৃভাব। সেইরূপ ভাষা-জননীও আপন স্তন্য কেবলমাত্র নিজ গর্ভজাত সন্তানকে পান করাইয়াই সার্থকতা অনুভব করেন না, পিপাসী শিশুমাত্রকেই মা সেই সুধা বণ্টন করিয়া দিতে শুধু প্রস্তুত নহেন—সতত লালায়িতা। আমার বিশ্বাস, এই বঙ্গভাষাই অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র ভারতে শিষ্টভাষা হইবে; ইতোমধ্যেই অনেক বাঙ্গালা পুস্তক হিন্দী, মারহাট্টা, গুজরাটী, তেলেগু তামিল, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালায় সাহিত্যও আছে, সাহিত্যিকও আছেন; নাই কেবল সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে সাহিত্য! পরস্পরের মধ্যে সেই সাহিত্যের অভাব এতদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে যে, সাহিত্য শব্দের মিলনার্থ আমাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে—সেই জন্যই আজ এই সাহিত্য-সম্মিলনে (?) সুধীজনকে "আহ্বান ক'রে ডেকে (?)" আন্‌তে হয়েছে। লোক-সমাজের মত সাহিত্য-সমাজেও বর্ণভেদ এক প্রকার সহজ অবস্থা, কর্ম্মগুণে গৃহী মানব সহজেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইয়া পড়ে, কিন্তু যেমন আমাদের সমাজপতির অভাবে এক্ষণে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিকৃত হইতেছে, আপনার ইচ্ছায় কেহ বা পৈতা ত্যাগ করিতেছে, কেহ বা পৈতা গ্রহণ করিতেছে, সেইরূপ সাহিত্য-সমাজেও সমাজপতির অভাবে সাহিত্যিকের মধ্যে বর্ণ-বিচার করিয়া থাক বাঁধিয়া দিবার লোকের অভাব, সেই জন্য আমার মত সংস্কারহীন সাহিত্যিকও আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে উদ্যত, আর যে রাজ্যে রাজরাজেশ্বরী-প্রণীত পুস্তকও কাঞ্চনমূল্যে বিক্রীত হয়, সে রাজত্বে মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ বাহাদুর, রাজা স্যার্ রাধাকান্ত দেব, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রভৃতির দেশেও যে কালে সাহিত্যিকমাত্রেই বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু যেমন যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্রোচ্চারণে হোমাদি ক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক দক্ষিণাপ্রাপ্তিতে সন্তোষলাভ করেন, তাঁহার অর্থ-গ্রহণকে বৈশ্যবৃত্তি বলা যায় না—আর যে 'বিপ্রবংশসম্ভূত বামুন ঠাকুর' "আব্রহ্মভুবনে লোকা প্রণিপত্য প্রচোদয়েৎ" "সপ্ত পাতক সংহন্তি সপ্তদুঃখ বিনাশিনী—" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়াই চাল কলা কাপড় পয়সার পুঁটুলি বাঁধিয়া রুক্ষমুখে যজমানের গৃহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার কার্য্যকেও ব্রাহ্মণবৃত্তি বলা যায় না, সেইরূপ গ্রন্থকারের মধ্যে অনেকেই পুস্তকবিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণ করিলেও

নিজের প্রতিভাগত ব্রাহ্মণত্ব অটুট্ রাখিয়াছেন ; আবার রক্তবীজের ন্যায় এক ঝাড় গ্রন্থকার বাড়িয়া উঠিতেছে—যাহারা মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতি যদৃচ্ছা মন্ত্রোচ্চারণে দক্ষিণাদানেই প্রভূত পুণ্যসঞ্চয়, এই নিগূঢ় তত্ত্ব পাঠক-পাঠিকাকে বুঝাইয়া দিতেছেন। সারস্বত ব্যভিচারের এই মহাপাতকে আমিও হয় ত অজানিতভাবে লিপ্ত আছি—যদি থাকি, আমার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই !

যাঁহার কুঞ্জদ্বারের পরিক্রম-সীমামধ্যে আজ এই সারস্বত উৎসব সম্পাদিত হইতেছে, সেই বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বঙ্গের সাহিত্য-সমাজে সমাজপতি-পদে সার্ব্ব-লৌকিকমতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; এই পদে আরোহণ করা বঙ্কিম বাবুর পক্ষে অসাধারণ গৌরবের বিষয়। কারণ, তিনি যখন প্রথম গ্রন্থ-রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর অনেকের নিকট তিনি নিজেই পাংক্তেয় বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই। মধুসূদনও পরলোকগমনের পূর্ব্বে দুই একটা চড়ুইভাতি বা প্রীতিভোজে নিমন্ত্রিত হইতেন মাত্র, বিবাহের বৌভাতে বা আদ্যশ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের পংক্তিভোজনে পাতা পাতিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। বৈদেশিক সমাজ হইতে প্রাপ্ত কৌলীন্যের পুষ্পমালা কণ্ঠে দোলাইয়াও রবিবাবু সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে এখনও সাহিত্য-সমাজপতি নহেন। এই জনতন্ত্র-যুগে স্বরাজের এই আখ্ড়াই বাজান'র দিনে এখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান ;—কেহ বা সাহিত্য-সুলতান, কেহ বা কাব্য-কৈসার, কেহ বা বিজ্ঞান-বাহাদুর, কেহ বা কবিবিরূপাক্ষ, কেহ বা নাট্যনেপোলিয়ন্ !

ইংরাজদের আর কিছু থাক্ না থাক্, বহুদিনের অভ্যাসযোগে একটা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালী গঠন করিবার শক্তিটা লাভ করিয়াছেন ; তাঁহাদের গ্রন্থকার-সমিতি আছে, পাঠক-সমিতিও আছে ; অভিনেতৃ-সমিতি আছে, অভিনয়-দর্শক-সমিতিও আছে ; তাঁহাদের "আমি" শব্দটি বৃহদক্ষরে লিখিবার প্রথা থাকিলেও কোনও কার্য্যবিশেষের উদ্দেশে দশটা "আমি"র তেবিজ করিয়া টোটালে একটা বড় "আমি" গড়িতে পারেন। একখানি রথ টানিবার সময় সকলে একটা কাছিতে হাত লাগাইয়া আপন আপন বলানুসারে একদিকেই টান দিতে পারেন। আমাদের কিন্তু ঐখানেই গোল ; পরাধীন জাতি আমরা, শক্তি-সঞ্চালনের ক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র, অতি সঙ্কীর্ণ ; সুতরাং যোগে-যাগে যদি একখানা রথ টানিবার সুযোগ পাই ত' অমনই সেই রথের গায়ে ইচ্ছামত কাছি বাঁধিয়া যে

যাহার কেরামতি দেখাইতে উদ্যোগী হই। রাম যদি দক্ষিণদিকে টানিতে যায়, শ্যাম অমনই মারেন হ্যাঁচ্‌কা পূর্ব্বদিকে—নেপাল টানেন পশ্চিমে ও গোপাল টানেন উত্তরে,—তাহাতে রথ উল্‌টাইয়াই পড়ুক আর নারায়ণ মাটীতে গড়াগড়িই যান, সে দিকে দৃক্‌পাত নাই, কে কেমন 'হেঁইয়োটান্‌' মারিয়াছি, শ্যামকে কেমন জব্দ করিয়াছি, গোপাল কেমন হারিয়া গিয়াছে—এই বাহাদুরী লইয়া তালপাতের ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে বাড়া ফিরি। পূর্ব্বে যে এক কর্ত্তা ও এক গৃহিণীর কর্ত্তৃত্বে বড় বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার সুখে স্বচ্ছন্দে পরিচালিত হইতে পারিত, তাহার মূল কারণ ছিল 'কর্ত্তাগিন্নীর' রাজমর্য্যাদাপ্রদীপ্ত মহৎ মন, ভাই বোন্‌ ছেলেমেয়ে নাতিনাত্‌নী বড়বৌ মেজবৌ ছোটবৌ এমন কি ঝি-চাকরেরও ঠোনাটা-ঠানাটা, চিম্‌টীটা-আস্‌টা সহ্য করিয়া সুশাসনকৌশলে, সমগ্র সংসার শান্তিতে পরিচালিত করিতে পারিত। ছেলে মেয়ে বৌরাও তাঁহাদের আদর্শে ভবিষ্যতের কর্ত্তা গিন্নী গড়িয়া তুলিবার জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত করিতে পারিত; এখনকার কর্ত্তাগিন্নীরা সে ধৈর্য্য, সে সহ্যগুণ হারাইয়াছেন, তাহার উপর খোকা-খুকীদেরও এখন আর 'তর্‌' সয় না—দোলায় দুলিতে দুলিতেই মতামত প্রকাশ করিতে ও হুকুম চালাইতে বাছারা উদ্‌গ্রীব হয়েন; তাই এক্ষণে একান্নবর্ত্তী সংসার একপ্রকার রূপকথায় দাঁড়াইয়াছে। এক উদরে জন্মলাভ করিয়াও ভায়ে ভায়ে মনের মিল হয় না, তা' আবার একপাড়া একগ্রাম একদেশে জন্মিয়াছি বলিয়া পাতান ভাইয়ের প্রেমে মাতিয়া উঠিব!

কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্ত্তন আমাদিগকে করিতেই হইবে। আত্মাভিমানরূপ পাপপুরুষই মিলন-পথে দস্যুরূপে দাঁড়াইয়া বঙ্গের সাহিত্য-পরিবারকে পরস্পরের নিকট অগ্রসর হইতে দিতেছে না; এই পরিবারের মধ্যে যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবীণ, তাঁহারাই অগ্রে স্নেহের হাস্যে অধর উৎফুল্ল করিয়া আদরের আলিঙ্গনের জন্য বাহু-বিস্তার করিয়া কনিষ্ঠদিগকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া আনুন, কাশ্মীরী শাল বিছাইয়া তাহাদিগকে বসাইয়া নিজে কুশাসন গ্রহণ করুন। কোনও শাস্ত্রেই অহঙ্কারীকে জ্ঞানী বলে না। এই বঙ্গদেশেই ভগবান্‌ অবতারস্বরূপ আসিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন—অমানীকে মান দিতে, তৃণাদপি সুনীচ হইতে। সাহিত্য-সংসারে যাঁহারা প্রবীণ, শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানবৃদ্ধ, তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা উচিত, তাঁহারা যাহা উইল করিবেন, সেই সম্পত্তিই

পরবর্ত্তী বংশ ভোগদখল করিবে; উইলে অহঙ্কার দান করিয়া যান, পরবর্ত্তী বংশও অহঙ্কারী হইবে; বিনয় দান করিয়া যান, পরবর্ত্তী বংশও বিনয়ী হইবে; উইলে প্রেম দান করিয়া যান, উত্তর পুরুষ প্রেমিক হইবে; বিদ্বেষ দান করিয়া যান, একটা বিদ্বেষী সাহিত্যিকের ঝাড় বঙ্গদেশে বিদ্বেষের বড়মানুষী করিবে।

আজ আমাদের এই সম্মিলন ঘটিয়াছে এক পুণ্যতীর্থে। ঐ অতি সন্নিকটে পূতসলিলা ভাগীরথী, পশ্চিম পারে চুঁচুড়া—যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের আদিগুরুগণের অন্যতম দেবোপম ভূদেব মুখোপাধ্যায় শুদ্ধান্তঃকরণে আজীবন সরোজবাসিনা সরস্বতীর শুভ্রচরণপ্রান্তে সিতশতদলের অঞ্জলি প্রদান করিয়া গিয়াছেন; বঙ্গের আদি নাট্যকার তারাচাঁদ শিকদারের সমসাময়িক স্বর্গীয় হরচন্দ্র ঘোষ সেক্স্পীয়রের 'মার্চেন্ট্ অফ্ ভেনিস্' বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেন; ঐ চুঁচুড়াতেই সহজকবি গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্রের প্রতিভার জ্যোতিঃতে নিজের কবি-যশঃপ্রদীপ মলিন হইতে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন; ঐ চুঁচুড়ার হুগ্‌লি কলেজই বাঙ্গালার অনেক কৃতী সন্তানের ধাত্রীমাতা, ঐ হুগলিতেই উইল্‌কিন্স সাহেবের অদ্ভুত অধ্যবসায়প্রসূত বাঙ্গালা অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হ্যাল্‌হেড্ সাহেবের ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। অদূরে শ্রীরামপুর—যেখানে মার্শম্যান্, কেরি প্রভৃতি মিশনারী মহাশয়গণের যত্নে বাঙ্গালার প্রথম ব্যবহারোপযোগী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সুপ্রকাশ ঐ শ্রীরামপুর হইতেই। মিশনারী মহাশয়দিগের উদ্যোগেই শ্রীরামপুর হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা অভিধান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল; যে কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ অদ্যাপি বাঙ্গালী-গৃহে চরিত্রগঠনের প্রধান আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, যে রামায়ণ-মহাভারত নিরক্ষর বঙ্গকে শিক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই রামায়ণ-মহাভারতও প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ঐ শ্রীরামপুর হইতেই।

তাহার পর ভাগীরথীর এই পূর্ব্বপার; বাঙ্গালার দ্বিতীয় নবদ্বীপ ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়ার পার্শ্বে আমরা উপস্থিত হইয়াছি; শত শত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, শুদ্ধাত্মা সাধক, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রবিৎ, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, রাজকবি ও পাঠকগণের অক্ষয় অমরস্মৃতির সহিত এই ভট্টপল্লীর নাম অতি মধুরভাবে জড়িত।

এই ভট্টপল্লী এখনও পণ্ডিতপ্রসবিনী। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ভারতবর্ষের পুরাতন মৃত্তিকা খনন করিয়া অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক

কঙ্কালে জীবন-সঞ্চার করিয়াছেন, তিনি যত্ন করিলে তাঁহার গৃহপ্রাচীরসংলগ্ন ভট্টপল্লীর গৌরবের ইতিহাস তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে দান করিতে পারেন। এই পুণ্যপল্লীর পণ্ডিত, কবি ও পাঠকগণের মহিমামাধুরীপূর্ণ পূত জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে তাঁহার সাহায্য করিতে পারেন—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ-প্রমুখ অনেক পণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌমের উজ্জ্বল স্মৃতি এখনও নবীন। পণ্ডিত প্রমথনাথের স্বর্গীয় পিতা কাশীনরেশের সভাপণ্ডিত কবি তারাচরণের সংস্কৃত কবিতারচনা সম্বন্ধে দৈবশক্তি ছিল; প্রশ্ন করিবামাত্র তিনি সুললিত সংস্কৃতে মুখে মুখে পদরচনা করিতে পারিতেন, ইহা আমি 'চোখে' দেখিয়াছি। বোধ হয়, যে ঋতুবর্ণনাদিসংবলিত সুললিত 'প্রতিমালা' বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ কথক মহাশয়রা এখনও আবৃত্তি করিয়া যশোপার্জ্জন করেন—তাহা ভট্টপল্লীরই কোন পণ্ডিত-রচিত।

উত্তরে কিঞ্চিদ্দূরে হালিসহর; সাধকোত্তম রামপ্রসাদের লীলাভূমিকে লোক হালিসহর বলিলেও, উহা প্রকৃতপক্ষে কালীসহর; এক দিন ঐ পুণ্যতীর্থ হইতে যে কালীনামের পবিত্রগাথা প্রবাহিতা হইয়াছিল, যুগযুগান্তরেও তাহা বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া রাখিবে। ঐ সহরেই ঈশ্বর গুপ্তভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া যৌবনে কবিতার মাধুর্য্যবৃষ্টি করিয়া বঙ্গের চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন।

তাহার পর কাঁঠালপাড়া। বঙ্গবাসীর পুণ্যতীর্থ—বঙ্গভাষার পুণ্যতীর্থ,বঙ্গসাহিত্য-সেবীর পুণ্যতীর্থ—কাঁঠালপাড়া। কে তিনি রসিক, যিনি ভবিষ্যসূচনা করিয়া ঐ ক্ষুদ্র গ্রামখানির নাম রাখিয়াছিলেন, কাঁঠালপাড়া? কাঁঠাল ভিন্ন অন্য কোনও তরু দেখি নাই, যাহাতে এক গাছে একসঙ্গে এত অধিক বৃহৎ বৃহৎ রসাল ফল ফলে! আবার এক এক ফলের ভিতর কত কোয়া! সঞ্জীব গিয়াছেন, বঙ্কিম গিয়াছেন, পূর্ণও সে দিন গেলেন। কিন্তু ইঁহারা বঙ্গসাহিত্যে যে সম্পদ্ দিয়াছেন, তাহা চিরদিন মধুময় থাকিবে। রেলওয়ের রাক্ষস-উদর ও বংশধরগণের অনাদর কাঁঠালপাড়ার প্রিয়দর্শন কবিকুঞ্জকে হতশ্রী করিয়াছে, তথাপি এমন একটি কাঁঠাল সেখানে ফলিয়াছিল, যাহার মোহিনী সুরভি মদির-মধুরতা ও প্রাণদায়িনী পোষণ-শক্তি আজীবন বঙ্গভাষাকে প্রফুল্ল, প্রমোদিত ও প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিবে। বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের নাম যদি গোবর্দ্ধন হইত, তবে তিনি যেমন 'বিষবৃক্ষ' লিখিতে পারিতেন না, তেমনই কাঁঠালপাড়ায় না জন্মিলে কাব্যাবতাররূপে তাঁহার আবির্ভাবেরও বুঝি

সম্পূর্ণ সার্থকতা হইত না। বাহিরে ফৌজদারী হাকিমের ভ্রূকুটিভঙ্গকুঞ্চিত কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রদ আবরণ, বোঁটার আটা একবার হাতে লাগিলে অনেক তেল খরচে তবে তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ হইত, কিন্তু ভিতরে কোয়ায় কোয়ায় ভরা—সেই কোয়ায় কি সুগন্ধ! আম আনারস পেয়ারা রম্ভা প্রভৃতি অনেক ফল সুগন্ধ ছড়ায় বটে, কিন্তু কাঁঠাল সময়ে সময়ে মাটীর নীচে ফলিয়াও সৌরভের আহ্বানে রসগ্রাহীকে আকর্ষণ করে! তাহার পর রস কি ঘন, কি স্বর্ণবর্ণ, কি মধুর হইতেও মধুরতর! কাঁঠালের ভিতর পাতকুষীও আছে, ভুতুড়ীও আছে, কিন্তু যে খাইতে জানে, তাহার নিকট পাতকুষী ভুতুড়ীও মিষ্ট! এমন অরুচির রুচি মিষ্ট বীচি কাঁঠাল ভিন্ন অন্য কোন ফলের আছে কি? বঙ্কিম-রসালের বীজ রসনাগ্রাহ্য আহার্য্য ত বটেই—তদুপরি সেই বীজ হইতে কত নবীন তরু উৎপন্ন হইয়া বঙ্গদেশকে রসাল ফলপ্রদানে পরিতৃপ্ত করিতেছে। বঙ্কিম-প্রসূতি কাঁঠালপাড়া, অবনত-মস্তকে ভক্তিভরে তোমার ধূলিতে আমি মস্তক লুণ্ঠিত করি, পুণ্যতীর্থ-দর্শনে ভক্তমনে যেমন ভগবানের উদ্দীপনা হয়, তেমনই তোমার দর্শনে কাঁঠালপাড়া, এই প্রাচীন অসাড় প্রাণেও কল্পনার সাড়া পড়ে!

চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, নরোত্তম দাস, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, রামপ্রসাদ সেন, কেতকা দাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের কবিদেবতাগণ কাব্যভুবনের অমরলোকে অনেক দিন অবধি বসতি করিতেছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি পূজনীয় পণ্ডিতগণ ইঁহাদের ও অন্যান্য বঙ্গীয় লেখকদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং সে সকল কথার পুনরুল্লেখ করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নহে। বৃটিশ-যুগে প্রথম সাহিত্যকর্ত্তাদের কথা আসিলেই প্রথমে মনে পড়ে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বর গুপ্ত ও রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর নাম। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" "ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী"র মত বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে আজ পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয়, কিন্তু তাঁহার 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' কেন যে বর্ত্তমানকালে পাঠকদিগের কাছে ততটা আদর পায় না, তাহা বুঝিতে পারি না; আদিরস ইদানীং মদনকে বিদায় দিয়া প্রণয় নাম পরিগ্রহ করিয়াছে, পেটে-পাড়ার পাট উঠাইয়া দিয়া সীমন্তে পাতা কাটিতেছে: মালতীমালা ভাসাইয়া দিয়া ক্যামেলিয়ায় কবরী আলোকিত

করিতেছে, চুয়া-চন্দন কেশরের পরিবর্ত্তে ক্লস্ হেজেলিন্ হেলিওট্রোপে অঙ্গরাগ করিতেছে, নলিনীপত্রশয়নে হা-হুতাশ না করিয়া সোফায় হেলান দিয়া আলুলায়িতকেশে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে বলিয়াই 'বাসবদত্তা'দি কাব্য এখনকার রুচির আদালতে সত্ব সাব্যস্ত করিতে পারিতেছে না। ভাবের সহজ সৌন্দর্য্য ও পদাবলীর রসমাধুর্য্যে ঈশ্বর গুপ্ত এক দিন সাহিত্যগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম প্রভৃতি সাহিত্য-মহারথিগণ প্রায় সকলেই প্রথম যৌবনে গুপ্ত কবির প্রতিভার দীপ্ত-আলোকের নিকট বসিয়া দাঁড়ি টানিয়া আসিয়াছেন। গুপ্ত কবির সঙ্গে সঙ্গেই খাঁটী বাঙ্গালা কবিতা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহার শব্দচাতুর্য্যের শর্করাসংযোগ আনারসের ন্যায় রসভরা মধুর ফলকেও মধুরতর করিয়াছিল; কাব্যকলার গব্যঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া তিনি তপস্বী মৎস্যকেও বিলাসী-পূজ্য ভোজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির পর বঙ্গদেশে অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেক কবিতা সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল জাতির মধ্যে বরণীয় হইবার উপযুক্ত; কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের রচনাপাঠের লালসা যে বর্ত্তমান শিক্ষিত জনগণের অন্তর হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এ কথা মনে করা যায় না; জরী বারাণসী তসর গরদ কিংখাব আপনার প্রাপ্য আদর ও সম্মান সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু 'সিমলের' কালাপেড়ে ধুতি বাঙ্গালীর কাছে চির-নূতন! আজকালকার লিখিত কি গদ্য, কি পদ্যকাব্যে যেন একটু ব্রাণ্ডির তীব্র উত্তেজনা, শ্যাম্পেনের উদ্দামপ্রফুল্লতা, শেরীর সুরভিমত্ততা আছে; সপ্তসাগরপারাগত এই মদিরমধু-সংযোগে আমাদের কাব্যের যে জাতিপাত ঘটিয়াছে, এ কথা আমি স্বীকার করি না, তবে মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন যৎকিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন গ্রহণের জন্য মনটা কেমন কেমন করে বটে!

বর্ত্তমান জাতীয় গদ্যের প্রাসাদগঠনে প্রথম কর্ণিক চালাইয়া গিয়াছেন, রাজা রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি। আমি বঙ্গ-ভাষার ইতিহাস লিখিতেছি না—মোটামুটি আলোচনা করিতে করিতে যে দুই চারিটি নাম মনে আসিতেছে বলিয়া যাইতেছি, তাহাও পর্য্যায়ক্রমে বলিতেছি না, সুতরাং অজ্ঞতা বা অনবধানতাবশতঃ অনেক নাম বাদ পড়িয়া যাইতেছে ও

যাইবে, তাহার জন্য উকীল পোষণে অক্ষম এই দীনের নামে অনুগ্রহ করিয়া কেহ মানহানির মকদ্দমা রুজু করিবেন না।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ও বিশেষ বিভাগীয় গ্রন্থগুলি বাদ দিলে, বাঙ্গালা-সাহিত্য বলিতে এখন যাহা বুঝায়, তাহা কবিতা ও কথা-সাহিত্য। কথা-সাহিত্য-প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে, টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচরণ মিত্রকে। টেকচাঁদ ঠাকুর শিউলীফুল কুড়াইয়া, কৃষ্ণকলি তুলিয়া, অপরাজিতা গাঁথিয়া, তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে' বাঙ্গালার সুবচনী পূজার এক গ্রাম্য মাধুরীপূর্ণ অপূর্ব্ব মালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'আলালের ঘরের দুলাল'—নামটি আটপৌরে বাঙ্গালা, ইহার ভাষা আটপৌরে বাঙ্গালা, ইহার ভাব, গল্প, পাত্র, পাত্রী—সব বাঙ্গালীর নিজস্ব। সংসারে নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে একেবারে দোষশূন্য যে কিছু আছে, বলা যায় না; সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'ও একেবারে দোষশূন্য হইতে পারে না। কিন্তু পরমপূজ্য রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে দুই একটি দোষ ধরিয়াছেন, তাহাতে আমি সায় দিতে পারি না—এ কথা আমি তাঁহার চরণে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন, "তাঁহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বলিল - মতি, তোমার ভগিনী ও বিমাতার সকল দিন আধপেটা খাওয়াও হয় না;—মতি অমনি রাগিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া মায়ের গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল।"—এই কথা কি মনে ধারণা করা যায়? ঐরূপ প্রহার করাইবার অগ্রে মায়ের সহিত কোনওরূপ কলহ করাইলে ভাল হইত না কি?—কেন? অশেষশাস্ত্রাধ্যায়ী পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় মাতার মস্তকচ্ছেদন করিতে পারেন, আর মূর্খ উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধতস্বভাব মতি তাহার মায়ের গালে একটি চড় মারিতে পারে না? আর প্রহারের পূর্ব্বে মাতার সহিত কলহ না করুক, মতি যে অভাবের দায়ে তাহার মনের সহিত কর্কশ কলহ করিতেছিল, এ কথা উক্ত না হইলেও, মনস্তত্ত্ববিদের নিকট সম্পূর্ণ ব্যক্ত। আর এক স্থলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শ্রাদ্ধবাড়ীতে বিদায়লোভে অনবরত গতায়াতের কথা উল্লেখ করাতেও "বামুনে বুদ্ধি প্রায়ই মোটা হয়" এই কথা বলাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় টেকচাঁদের নিন্দা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেমন করিয়া মনে করিলেন, প্যারীচাঁদবাবু পরমপূজ্যপাদ উদারপ্রাণ স্বাধীনচেতা অধ্যাপকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ করিয়াছেন? সেকালের কথা দূরে থাক্, আজ পর্য্যন্ত সেরূপ অধ্যাপকগণ পত্র

আদায় করিতে কাহারও দ্বারে উপস্থিত হয়েন না, অনেক আরাধনা করিয়া তবে তাঁহাদিগকে পত্র গ্রহণ করাইতে হয়। মাসী পিসী ভাগিনেয় জামাই প্রভৃতির সুপারিস লইয়া যে সব বিপ্রবংশসম্ভূত অদ্ভুত পদার্থরা একমাত্র অধ্যাপকগণের প্রাপ্য পত্রের অংশীদার হইতে আসেন, মিত্র মহাশয় তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। আর ন্যায়শাস্ত্রে বিপুল ব্যুৎপন্ন হইয়াও, পণ্ডিতগণের যে বিষয়বুদ্ধি কম থাকে, প্যারীবাবু তাহাই বোধ হয় বলিয়াছেন।

একটা কথা আমি সাধারণভাবে বলিয়া যাই। রহস্য করিলেই যে গালাগালি দেওয়া হয়, অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করা হয়, এইরূপ একটা সাধারণ ভ্রমাত্মক গোলমাল অনেকের মনে আছে। এ দেশে ঠাকুরদাদারা নাতী-নাতিনীকে শালা-শালী বলিয়া ঠাট্টা করেন। তাহা কি গালাগালি না অনাদরপ্রদর্শন? আগেকার ভক্তবৈষ্ণব-পরিচালিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক যাত্রার পালাতেও বৈরাগীর সং আনিয়া রঙ্গ করা হইত—সেটা কি বৈষ্ণবনিন্দা? সেকালে য়ুরোপে ধর্ম্মপুস্তকের অংশবিশেষকে নাট্যাকারে পরিণত করিয়া Mystery নামক এক জাতীয় অভিনয় হইত, ঐ অভিনয়সূত্রে রঙ্গরসের উদ্দেশে বাইবেলোক্ত চরিত্র লইয়াও হাস্যরসের অবতারণা হইত,—কিন্তু তাহাতে কেহ খৃষ্টধর্ম্মে বিদ্রূপ করা হইতেছে, এরূপ মনে করিত না। সার ওয়াল্‌টার স্কট লিখিয়াছেন যে, আয়ারলণ্ডের ন্যায় গোঁড়া ক্যাথলিক প্রদেশেও ঐরূপ রঙ্গরস হইত; কিন্তু তাহাদিগের হৃদয়ের ভক্তি কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইত না।

যে কথা সাহিত্যের উজ্জ্বল অলঙ্কারে বঙ্কিমবাবু-প্রমুখ কাব্যোপাসকগণ বঙ্গের ভাষাপ্রতিমাকে সুসজ্জিতা করিয়াছেন, তাহার প্রথম বেশকারী যে টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারীচাঁদ মিত্র, তাহা বোধ হয়, অস্বীকার করা উচিত নহে; তবে প্যারীচাঁদবাবু দেবীকে যে কাপড় পরাইয়াছিলেন, তাহা একেবারে কোরা—তাঁত হইতে নামান ও মায়ের হাতে দিয়াছিলেন—দুইগাছি রুলী ও শাঁখা! বঙ্কিমবাবু এক দিকে সেই বসন উত্তম 'ধোপদস্ত' করিয়া এবং অপর দিকে সরল সংস্কৃতে বাজু বাউটী একটু হাল্‌কা করিয়া গড়িয়া মায়ের অঙ্গরাগক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর যে ভাষার ছটায় আজ বঙ্গবাসী মন্ত্রমুগ্ধ, সেই ভাষার মূল বোধ হয়, যেন উন্নত "আলাল" ও মন্দীভূত "জয়দেব।"

বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নাম বাদ দিলে অপরাধ হয়। কলিতে অশ্বমেধযজ্ঞের প্রথা প্রচলিত না থাকায়, বঙ্কিমবাবু মহাসমারোহে দুর্গোৎসব করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সিংহ মহোদয়ের গদ্য মহাভারত সাহিত্যরাজ্যে এ যুগের অশ্বমেধ। সত্য, তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে ঐ লোককল্যাণকর ক্রিয়া করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যেমন Hamiltonএর বাড়ীর অলঙ্কার নিপুণ দেশী কারিকর দ্বারা প্রস্তুত হইলেও, উহা Hamiltonএর বাড়ীরই গহনা, তেমনই কালীসিংহের মহাভারত কালীসিংহেরই মহাভারত। বঙ্গভাষাকে তাঁহার আর এক দান 'হুতুম পেঁচার নক্সা'; অধিক পরিমাণে গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট হইলেও, 'হুতুম পেঁচা' 'হুতুম পেঁচার'ই মত মিষ্ট—উহার আর অন্য তুলনা নাই। বোধ হয়, 'হুতুম পেঁচা' প্রকাশের পর, ষাটবার বর্ষবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত ও-ধরণের পুস্তক আর বাঙ্গালাভাষায় কেহই লিখেন নাই। 'হুতুম পেঁচা' শুধু রহস্যের খান নয়—এক সময়ের বঙ্গদেশের—অন্ততঃ কলিকাতা নগরের সামাজিক ইতিহাস।

ঈশ্বর গুপ্তের "মেউটনী" প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন, তাঁহার নাম রঙ্গলাল। তাঁহার "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?" আবৃত্তি করিয়া বাখারি ঘুরাইয়া আমি এক দিন ছেলেবেলায় খেলা করিয়াছি। জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদিরপুর প্রসিদ্ধ; কিন্তু এখানে এক সময়ে বড় বড় কয়খানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম—রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।

বৃটিশ বাঙ্গালী এক দিন My dear Fatherকে বাঙ্গালায় (মাতৃভাষায়) পরম পূজনীয় পিতা লিখিতে লজ্জা বোধ করিতেন, আর আজ সেই বাঙ্গালী—ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী গভীরতম চিন্তাপ্রসূত সন্দর্ভ সকল আপনার ভাষায় লিখিতেছেন, মাতৃভাষার পূজা করিয়া ধন্য হইতেছেন! বাঙ্গালার গ্রন্থকারের সংখ্যা আজ গণনা করা যায় না, তাই আজ কি আনন্দের দিন! এ আনন্দ বাঙ্গালায় কে আনিল? বঙ্গদেশকে গঙ্গাস্নান কে করাইল? এই

পবিত্র যজ্ঞের পুরোহিত বঙ্কিমচন্দ্র। ভাষাকে ভ্রাতৃবধূবোধে কি সংস্কৃত-জ্ঞানাভিমানী, কি ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী সঙ্কোচে মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন। দীনবন্ধু, রামদাস সেন, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি তন্ত্রধারক পূজক বেশকারীদিগকে সঙ্গে লইয়া পুরোহিতরূপে বঙ্কিমবাবুই প্রথমে যেন মন্ত্রবলে তাঁহাদের মুখ ভাষাদেবীর দিকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ, উনিই তোমাদের মা!" শুভক্ষণে ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শন' প্রচারিত হইল; সকলে দেখিল, মায়ের মুখ কি সুন্দর! কি পবিত্র! কি মাধুর্য্যমণ্ডিত তেজোজ্জ্বল! তখন জ্ঞানকাননের কুসুমরাশি আহরণ করিয়া সকলে মায়ের পদে অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প ঢালিয়া দিতে লাগিল; চিন্তা ও কল্পনার ভাণ্ডার হইতে হিরণ্যহীরা মণিমুক্তা বাহির করিয়া মাতৃদেবীর অঙ্গে ভূষণ পরাইতে লাগিল;—স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, কলিকাতায় 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্য্যদর্শন' প্রকাশিত হইল; ঢাকায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' প্রতিষ্ঠিত করিলেন; প্রাচীন ঋষিগণের চিন্তা, সংস্কৃত দার্শনিক সংহিতাকার ও কবিগণের চিন্তা, ইংলণ্ডের চিন্তা, ফ্রান্সের চিন্তা, জার্ম্মাণীর চিন্তা, ইটালীর চিন্তা এই সকল পত্রিকার পৃষ্ঠে মঙ্গলময় কোমল বাঙ্গালায় কথা কহিতে লাগিল। 'বঙ্গদর্শনের' পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় সাময়িক পত্রিকা ছিল বটে—তন্মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচালিত 'রহস্য-সন্দর্ভের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; সে সকল পত্রিকা মিশনরী কার্য্য দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালীকে বাঙ্গালায় Baptise করিল 'বঙ্গদর্শন'। বঙ্কিমবাবু যদি বাঙ্গালায় একখানি পুস্তকও না লিখিয়া শুধুই 'বঙ্গদর্শনের' প্রবর্ত্তনা করিতেন, তাহা হইলেও তিনি ধন্য হইতেন এবং বঙ্গদেশও ধন্য হইত।

ধন্য হইত,—বলিলাম কি, বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের অগ্রগণ্যা আমার বঙ্গমাতার ন্যায় ধন্যা ভূমি আর কোথায়? মা, আজ তুমি দুর্ভিক্ষের দায়ে উপবাসী, বন্যার প্লাবনে কাল তোমার বক্ষে জলরাশি, বিদেশী তোমায় উপাধি দিয়াছে—দাসী, তোমার লেখনীতে আইনের ফাঁসী, ধনবলে তুমি দীনা, পশুবলে তুমি ক্ষীণা—তথাপি কিঞ্চিদধিকগত শত বৎসরের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের এই বেলাভূমিতে নারিকেলের ন্যায় পিপাসাহারী, তরমুজের

ন্যায় স্নিগ্ধকারী, আনারসের ন্যায় রসবর্ষী, ইক্ষুর ন্যায় মধুস্রাবী, আম্র-পনসের ন্যায় মিষ্টতায় তুষ্টিদায়ী ফলের রাশি ভারতে আর কোথায় ফলিয়াছে? বাঙ্গালার পদ্যেও কবিতা, গদ্যেও কবিতা। নদী-মাতৃকা বলিয়া কি মা তুমি এমন কুলুকুলুকলে বিশ্ববিমোহন গান গাহিতে শিখিয়াছ? ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যেন্দ্র দত্ত, কালিদাস রায়, জীবেন্দ্রকুমার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক পর্য্যন্ত কত বাণীপুত্র না তুমি অঙ্কে ধারণ করিয়াছ! রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত কাহার নাম করিব, কত নাম করিব; সে নামাবলী ত' অক্ষরে অক্ষরে আপনাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে! আমি কাহার মৃত্যুতে—কাহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করি না—একে ত' মৃত্যুশোক বা mourning কথা হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত নাই, তাহার পর, যে কবি মরে—সে কবিই নয়। কবির প্রাণের সহিতই আমাদের পরিচয়, দেহের সহিত আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই;—আমি এখানে ব্যাপকার্থে কবি শব্দ ব্যবহার করিতেছি—অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র জীবিত, তারানামে রামপ্রসাদ যম-জয়ী। বৃটিশ-বঙ্গে নূতন চিন্তা ত' রামমোহন রায়রূপে প্রাণে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত, রহস্যসন্দর্ভের দর্ভাসনে বসিয়া রাজা রাজেন্দ্রলাল এখনও প্রত্নতত্ত্বের ধ্যানে মগ্ন, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামদাস সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র বসু—সবাই অমর, জীবিত!

এই আষাঢ়ে আনারস মুখে দিয়া রসনাপরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের আনারস-রসে হৃদয় পুলকিত করি; মধুসূদনের মেঘনাদ কি আজও শঙ্খনাদে বঙ্গের মঙ্গলসূচনা করিতেছে না? হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" এখনও এই প্রাচীন প্রাণে বসন্তের বাতাস বহাইয়া দেয়। যে হেমচন্দ্র এক দিন বারাণসীতে বসিয়া ঐ "হুতাশের আক্ষেপের" শ্লেষাত্মক অনুকরণ শুনিয়া নিজের বিদ্রূপের নিজে প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই উদারহৃদয় রসরাজের কি কখনও মৃত্যু হয়? সারস্বতকুঞ্জের এই ভ্রমররা অমর, "পলাশীর যুদ্ধ" লিখিয়া নবীন বিখ্যাত—চিরজীবিত। নবীন আমার প্রথম যৌবনের বন্ধু, যখন দুই দশ জন অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ভিন্ন নবীন ডেপুটী নবীনের অন্তরে যে কবিতার

যাদুমন্ত্র আছে—আর কেহ জানিত না, তখন আমার নবীনের সহিত পরিচয়, আর আজ এই দীর্ঘ তিপান্ন বৎসর পরেও আমার মনে হয়, তাহার সহিত নিত্য বসি, নিত্য কথা কই। স্বদেশভক্ত বন্ধু কাব্যবিশারদ, হৃদয়খানা বড় বিশাল ছিল বলিয়াই কি বিশাল সাগরবক্ষে দেহরক্ষা করিলে? তোমার স্নেহের মাধুর্য্য, তাহাতে লবণসমুদ্রও ক্ষণেকের জন্য ক্ষীরোদ হইয়া যায়! আর বঙ্কিম! বঙ্কিমের যদি নাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এখনও কে মোহন মুরলী বাজাইতেছে? আর সেদিনকার বাছা সত্যেন্দ্রাদি অনেক গান গাহিয়া মায়ের কোলে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আর্য্যগণ নারীকেই যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজা করিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতার প্রমাণ করিবার জন্যই বুঝি সিতশতদল-শুভ্র কল্পনার মতিমালা হৃদয়ে দোলাইয়া বঙ্গের অমৃতকাননে এত অঙ্গনা বীণা বাদন করিতেছেন! আমার যৌবনকালে যখন এদেশে বিদুষী নারীর সংখ্যা একমাত্র অঙ্গুলির পর্ব্বে গণনা করা যাইতে পারিত কি না সন্দেহ, তখন পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "দীপনির্ব্বাণ" পড়িয়া চমকিত হইয়া মনে করিয়াছিলাম, আমাদের দেশে মহিলা কি এত শিক্ষিতা হইতে পারেন! তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা এই কথা জানিয়া তবে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাঁহার রচিত গীত-কবিতাদি তাঁহাতেই সম্ভব! মধুসূদন দত্তের বংশে কবিতা জীবিতা রাখিয়াছেন শ্রীমতী মানকুমারী। তাঁহার শ্বশুর-গৃহের সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকায়, দত্ত-কুল-বধূ কল্যাণীয়া শ্রীমতী গিরীন্দ্রকুমারীর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় আমি বহুকাল পূর্ব্বে পাইয়াছি। তাঁহার রচনায় একটা সরল সহজ সৌন্দর্য্য আছে। মাননীয়া শ্রীমতী কামিনী রায়ের প্রতিভাপূর্ণ সৌন্দর্য্য তাঁহার কবিতার সাহায্যে আমি মানস-নয়নে মাত্র দেখিয়াছি! তাঁহার লেখা আমার বেশ মিষ্ট লাগে। জ্যোতির্ম্ময়ী ও রাণী মৃণালিনীর রচনাতেও সৌন্দর্য্য আছে। একে সাবিত্রীর অশ্রুজল, অন্যে গোপ-বধূ-নয়ন-বিগলিত বারিবিন্দু। ঘোষ-জায়া শৈলবালার রচনাও বড় মিষ্ট। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ও হিরণ্ময়ী সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরপ্রশংসিতা। আমার বড় আক্ষেপ, সহজ কবি তরুদত্ত তাঁহার বালিকা প্রাণের উচ্ছ্বাস নিজের মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই! শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা কুমুদিনীও সারস্বত-সরসী আলো করিয়া আছেন। শান্তা ও সীতা

দেবীর রচনা পড়িবার জন্য অনেকেই আমার ন্যায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন। আরো অনেক বঙ্গ-মহিলার রচনার গৌরবে বাঙ্গালীর বাঙ্গালী বলিয়া গর্ব্ব করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। আর গুটি দুই-তিন নাম করিব। অনুরূপা ও সুরূপা (ইন্দিরা) আমার অতি স্নেহের পাত্রী।

আর একটি বালিকার কথা মাত্র উল্লেখ করিব—তিনি নিরুপমা দেবী। রূপ দেখি নাই, কিন্তু গুণে যে তিনি সার্থকনাম্নী তাহাতে সন্দেহ কি! অন্যান্য কথা-সাহিত্য-লেখকদিগের মধ্যে দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম আমাকে সর্ব্বাগ্রে সসম্মানে উচ্চারণ করিতে হয়। তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্বর্ণলতা একেবারে খাঁটী সোনা। পল্লীজীবনের কি করুণ কাহিনীর গার্হস্থ্য চিত্রই তারকবাবু লিখিয়া গিয়াছেন! তারকবাবুর নিকট হইতেই মূলধন ঋণ করিয়াই আমি রঙ্গ-মঞ্চ হইতে 'সরলা'র সৌন্দর্য্য একদিন বঙ্গবাসীকে দেখাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের পর, কল্যাণীয় শ্রীমান্ হারাণচন্দ্র তাঁহার পল্লীবাসে একটু বিশ্রাম করিয়া লইতেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প এই প্রাচীন প্রাণকে পুলকিত করিয়াছে। রবিবাবুর গল্পগুচ্ছের ন্যায় প্রভাতবাবুর গল্পগুলিও আমি বার বার পড়িয়াছি; এখনও অবসরে পাঠ করিতে ইচ্ছা করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর আজ ঘরে ঘরে, এ আদর-লাভে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলেখক স্নেহাস্পদ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্পগুলি অবসর সময় বিনোদনের উৎকৃষ্ট উপাদান।

নাম করিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এ যুগে নামমাহাত্ম্য বলিয়া বোধ হয়, নাম করিতে করিতে নামতা বাড়িয়া গেল। আর একটি নাম বাকী রাখিয়াছি —তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া অবশেষে বলিতে হয় ওঁ তৎসৎ! এইবার ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ মাত্র করিব! পূর্ব্বাচার্য্যগণ নবোদিত তরুণ অরুণের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া "নমো জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং" বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন, মধ্যাহ্ন-ভাস্করের দিকে চাহিবার শক্তি কাহার যে অসহনীয় তেজোদীপ্ত প্রভার ধ্যান বা স্তব করিবে! কবি-কুলোজ্জ্বল রবি এক্ষণে বঙ্গ গগনের শীর্ষদেশে বিরাজ করিয়া লোককে আলোকিত, পুলকিত, উদ্দীপিত ও

সঞ্জীবিত করিতেছেন। বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণ-সাহায্যে যে জ্যোতিষ্কের প্রতি লক্ষ্য করিতে অক্ষম, যাঁহার কাব্য-সলিলে প্রতিফলিত রূপের প্রতি চাহিলেও সাধারণ লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কেবল কিরণানুভবে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিতে পারে মাত্র। জগতে জ্যোতির্ব্বেত্তা-গণ সূর্য্যাভ্যন্তরস্থ রেখা-বিন্দুআদি দর্শনের লালসায় সর্ব্বগ্রাসের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি আম্রের অমৃততুল্য রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত, চুতফলের উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে আমার প্রয়োজন নাই, সেইজন্য করুণাময় জগদীশ্বরের চরণে বার বার প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করি যে, আমাদের এই রবি যেন কখনও কোন পাপগ্রহ দ্বারা পাদমাত্র গ্রস্ত না হয়েন, তাঁহার পূর্ণ প্রকাশে যেন জগৎ চির-পুলকিত, চির-আলোকিত ও চির-জীবিত থাকে!

একবার একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, তিনি লণ্ডনে কোন সময়ে তাঁহার পার্শী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বন্ধু, উচ্চশিক্ষিত হইয়াও কিরূপে সূর্য্যরূপ একটি জড়গ্রহের উপাসনা কর? তাহাতে পার্শী মহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন যে, আপনি ত' কখনও সূর্য্য দেখেন নাই, তাই কেন সূর্য্য উপসনা করি, বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কিছুকাল পরে ঐ ইংরাজ ভ্রমণচ্ছলে ভারতবর্ষে আসিয়া জবাকুসুম-সঙ্কাশ সূর্য্য দেখিয়া বলিয়াছেন, "হ্যাঁ, এই সূর্য্যের সম্মুখে ভক্তিভরে স্বতঃই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।" আত্মোপাসক অনেক ইংরাজের বিশ্বাস, বর্ব্বর বাঙ্গালীদের এক-দুই গণনা শিক্ষা পর্য্যন্ত তাঁহারাই দিয়াছেন। আমাদের রবিকে দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন, এ সূর্য্যের আলোকে যে দেশ প্রদীপ্ত, সে দেশ বারাণসীর ন্যায় ভৌগোলিক অস্তিত্বের বহির্ভূত তীর্থক্ষেত্র!

বাঙ্গালার প্রথম নাটক সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ বলেন, তারাচাঁদ শিকদারের ভদ্রার্জ্জুন; কেহ বলেন হরচন্দ্র ঘোষের Merchant of Veniceএর অনুবাদ 'ভানুমতী চিত্র-বিলাস'; কেহ বলেন রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব'। আমি যতদূর জানি, তাহাতে ভদ্রার্জ্জুনকেই প্রথম প্রকাশিত বলিয়া বোধ হয়, এবং হরচন্দ্রবাবুর মার্চেণ্ট্ অব ভিনিস্ এর অনুবাদ তাহার অতি অল্প পরেই প্রকাশিত হয়, 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' তাহার পর। প্রথম দুইখানি কখনও অভিনীত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই, গরাণহাটায় ৺জয়রাম

বসাকের বাটিতে তাঁহার দ্বারা বদ্‌লানো কুল-সর্ব্বস্বের অভিনয় হইয়াছিল। প্রায় ঐ সময়েই বোধ হয়, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের বাটীতে তাঁহার অনুবাদিত 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকও অভিনীত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' তর্করত্ন মহাশয়ের লেখা নহে; তাঁহার অগ্রজ প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ নাটকখানি রচনা করেন। আমারও মনে কতকটা ঐ কথা লাগে, কেননা তর্করত্ন মহাশয়ের রচিত 'রত্নাবলী,' 'বেণী-সংহার,' 'মালতী-মাধব,' 'নব নাটক' প্রভৃতি পুস্তকে দেখা যায় যে, তিনি বর্ত্তমান কালের অভিনয়-উপযোগী করিয়া তাঁহার নাটকসকল ইংরাজী ধরণে অঙ্ক ও 'সীন্‌' বা গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে' সে রকম একেবারে নাই। উহাতে এক ব্রাহ্মণ আগন্তুককে বলিলেন, আপনি দাঁড়ান, আমি বাড়ীর ভিতর গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসি—তারপরই লেখা (অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া) ও ব্রাহ্মণী, ও ব্রাহ্মণী, শোনো—এইরূপ সব আছে। হইতে পারে যে পাইক-পাড়ায় অভিনয়-সময়ে বঙ্গের নটগুরু স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির ইঙ্গিতে তিনি ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে'র সেই—

> ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
> কচুরি তাহাতে খান দুই।
> ছক্কা আর সরভাজা, মতিচুর, বোঁদে গজা,
> ফলারের যোগাড় বড়ই।
>
> *　　　*　　　*
>
> গুমো চিঁড়ে জলো দই—চিত্তো গুড় ধেনো খই,
> পেট ভরা খালি নাহি হয়—

লেখার প্রলোভন সহজে পরিত্যাগ করা যায় বলিয়া বোধ হয় না; অন্ততঃ নব-নাটকে ওরূপ দু'একটা বুক্‌নি তিনি না দিয়া ছাড়িতে পারিতেন কি? দীনবন্ধু নীলদর্পণে "ময়রাণী লো সই, নীল গেঁজেছ কই"—লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; নবীন-তপস্বিনীর "মালতী মালতী মালতী ফুল" ভুবনে অতুল, বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়োরও "এলোচুলে বেণে বৌ আল্‌তা দিয়ে পায়—নোলোক নাকে কলসী কাঁখে জল আন্‌তে যায়—" এ কি আর কেহ লিখিতে পারিবে?

লীলাবতীর অত মধুর কবিতার মধ্যেও "মাছি মাছি মাছি সতীন হলে বাঁচি" এ কথাও আছে।

সে যাহা হউক, প্রথমেই অভিনয়-উপযোগী নাটক রচনা করিয়া পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় যে বঙ্গদেশে অভিনয়ের পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এদেশে যাঁহারা নাট্য-চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের "তর্করত্ন-তিথি" বলিয়া তাঁহার জন্মদিন-উপলক্ষে একটি পর্ব্বাহ প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। এ বুদ্ধি আমার আগে আসে নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইতেছি।

ইংরাজি নভেল বা রোমান্সের ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষায় নভেল বা উপন্যাসাদি প্রচলনের পূর্ব্বে এদেশে নাটকই অনেক পরিমাণে লিখিত হয়। এক সময়ে শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এমন ধারণা ছিল যে, কথোপকথনে পুস্তক লিখিলেই তাহা নাটক হয়; যদুবাবুর "ধাত্রী-শিক্ষা"কেও নাটক মনে করিতেন, এমন লোক বিরল ছিল না। বটতলার এক সময়ে প্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা বেণীমাধব দের এক পুত্র লালবিহারী আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন; তাঁহার স্নেহে আমি অনেক বাঙ্গালা পুস্তক ক্রয় না করিয়া পাঠ করিয়াছি। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কলিকাতায় একটিও সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ঐ সময়ে এক দিন আমি আইন-সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক বলিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করি; কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়াই দেখিলাম, দুই সইয়ের কথোপকথন-চ্ছলে উহা ভাল উকিলের লেখা একখানি Penal Codeএর বঙ্গানুবাদ! তবে আমি এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তখনকার ঐ বটতলা-প্রকাশিত নাটক ও প্রহসনের মধ্যে কোন কোন খানির ভিতর এমন সুন্দর ও সরস জিনিষ ছিল, যাহা এক্ষণে কোন ভাল লোক দ্বারা সম্পাদিত হইলে অভিনয়-উপযোগী ও রসজ্ঞগণের মনোরঞ্জনকারী ভাল নাটকই হইতে পারিত।

আর একজন প্রশংসনীয় নাট্যকার ছিলেন ৺মনোমোহন বসু। ইনি যেন তর্করত্ন এবং দীনবন্ধু ও মধুসূদনের মধ্যে সংযোগস্থল, সেকালের সহিত একালের মিলনের গাঁট-ছড়া।

কিন্তু দীনবন্ধু ও মধুসূদন হইতেছেন—দুইজন যাঁহারা বিলাতী দিয়াশলাই ঘষিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া বর্ত্তমান বঙ্গে নাট্যকারগণের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। বিলাতী দিয়াশলাই ঘষিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা সুরভি তৈলাধার

মঙ্গল-প্রদীপই জ্বালিয়াছিলেন—চর্ব্বির বাতি জ্বালেন নাই! উক্ত কালে সেই দীপ হইতেই নিজে প্রদীপ্ত প্রতিভা-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া বঙ্গের সর্ব্বজন-সমাদৃত গিরিশচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত, ভক্তমাল প্রভৃতি তীর্থস্থ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নাট্যকলা প্রতিমার আরতি করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষায় আজ পর্য্যন্ত এমন কোন নাটক, নাটক কেন বলি, অন্য কোনরূপ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই, যাহাতে এ দেশের পল্লী-জীবন, সেই জীবনের গার্হস্থ্য দৈনিন্দিন ঘটনা, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, অবসাদ-উত্তেজনা নীল-দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল জীবন্তভাবে প্রতিফলিত আছে! যাঁহারা নীল-দর্পণের ভাষাদি লইয়া এক্ষণে সমালোচনা করিতে বসেন, তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, নীল-দর্পণ লেখা হয় বারো-শত সাতষট্টি সালে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে গ্রাক-ধরণে ট্রাজেডি লেখা নিষিদ্ধ; কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে মানবের বৃত্তি ও রুচিরও পরিবর্ত্তন হয়, সেইজন্য দীনবন্ধুর নীলদর্পণে ও মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারীতে বাঙ্গালায় ট্রাজেডি লেখার প্রথম সূত্রপাত। পরবর্ত্তী অনেক নাট্যকারই কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহাদের আদর্শ করিয়াছেন। 'কৃষ্ণ-কুমারী' সম্বন্ধে আমার একটা সংস্কারের কথা বা কুসংস্কারের কথা এখানে বলিয়া রাখি। আমার বোধ হয়, কোন বিঘ্নকারী নক্ষত্রের সঞ্চার-কালে মধুসূদন তাঁহার কৃষ্ণকুমারী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! অমন অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটকখানি নহিলে এত অপয়া হইল কেন? 'রত্নাবলী' একখানি উৎকৃষ্ট নাটক হইলেও ঐ দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ে পূর্ব্বরাগ, বিরহ, ঈর্ষ্যা, বিস্ময় প্রভৃতি রসের অবতারণা অতি মৃদু-কোমল ভাবেই হইত, তাহাতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আগ্রহ-উত্তেজনাদির এমন তীব্রতা ছিল না, যাহাতে বর্ত্তমান বঙ্গের প্রাণে তরঙ্গ উত্থিত করিতে পারে। সেইজন্য পাইকপাড়া রাজ-বাটীতে অভিনয়ের জন্য মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা করেন। কিন্তু কি জানি, কি গোল হইয়াছিল, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই,—কিন্তু অভিনয়ের উদ্যোগেই পাইক-পাড়ার নাট্য-সমাজ উঠিয়া গেল। পরে শোভাবাজার রাজবাটীতে কৃষ্ণকুমারী অতি প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়, কিন্তু প্রথম অভিনয়ের অল্পদিন পূর্ব্বেই ঐ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও উদ্যোগী সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের আদি রঙ্গমঞ্চে ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশবাবু প্রথমে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তি সঞ্চার করেন বটে, কিন্তু তাহার কয়েক সপ্তাহ পরে আমাদের মধ্যে যে একটু দলাদলি ঘটিল, তাহা ঐ কৃষ্ণকুমারীর একটা অভিনয়ের পরেই! স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শে ও নিজ নিজ হৃদয়ের ভক্তি-আদর্শে যতবারই আমরা মধুসূদনের অনাথ সন্তানগণের সাহায্যার্থে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় করিয়াছি, ততবারই হয় একটা জল-ঝড় হইয়া দর্শক-সমাগমে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে অথবা সম্প্রদায়ের ভিতর দুষ্ট রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাহাকে অঙ্গহীন করিয়াছে—শ্যামের পাঠ রামকে দিয়া, রাখালের পাঠ নেপালকে দিয়া একরূপে কাজ চালাইয়া লইতে হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারী, তোমার অলৌকিক রূপ উদয়পুরের রাণা-বংশে অনর্থ ঘটাইয়াছিল, নিজ দেহদানে তোমার পিতৃগৃহের শান্তি তুমি কতকটা রক্ষা করিয়াছিলে, আর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', তোমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বার-বার রঙ্গমঞ্চে বিপর্য্যয় ঘটায় দেখিয়া বর্ত্তমান নাট্যশালার পরিচালকগণ তোমার বক্ষে আর ছুরিকা বিদ্ধ না করিয়া পূজা-ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন!

"একেই কি বলে সভ্যতা" লিখিয়া মধুসূদন বঙ্গ ভাষায় প্রহসনের সৃষ্টি করেন। এখানিতে বঙ্গের যে নবীন সমাজ তখন উদয়াচলে, তাহারই বিদ্রূপাত্মক আলেখ্য সুনিপুণ শিল্পীর দক্ষতায় অঙ্কিত; ছোট-বড় প্রত্যেক চরিত্র পূর্ণাবয়বে গঠিত, ছায়ালোকের সমতা রক্ষা করিয়া প্রাকৃতিক বর্ণে রঞ্জিত "একেই কি বলে সভ্যতা" প্রথম পটোত্তোলনে দর্শকের অধরে মৃদু-মধুর হাসি ফুটাইতে আরম্ভ করিয়া শেষে সকলকে হা-হা-হা-হো-হো-হো করিয়া হাসাইয়া যবনিকা ফেলিয়া দেয়। তাঁহার দ্বিতীয় প্রহসন "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" প্রাচীন সমাজে যে দুষ্ট গ্রহ তখন অস্তাচলে, ব্যঙ্গরঙ্গে তাহাকে বিদায় দিবার জন্যই এই প্রহসনের অবতারণা। পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এই প্রহসনখানির নিন্দা করিয়াছেন! মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া বলিতেছি, ন্যায়রত্ন মহাশয় দৃশ্য-কাব্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইলেই ভাল করিতেন, তাঁহার পুণ্য-পূর্ণ চক্ষু হরিনাম মুদ্রাঙ্কিত বক্ষ দেখিয়াই শান্তি অনুভব করে, ঐ চক্ষের অভ্যন্তরে ব্যভিচার যদি বীভৎস ক্রীড়া করিতে থাকে, তাহা তাঁহার-সরল দৃষ্টি অতিক্রম করে।

"একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়ে কৌতুক অধিকতর পরিপুষ্ট ও সুন্দর করিয়াই দীনবন্ধুবাবু বঙ্গ-সাহিত্যকে "সধবার একাদশী" ও "বিয়ে পাগলা বুড়ো" কৌতুক দিয়াছেন। আর একখানি প্রাচীন নাটকের উল্লেখ করিতেছি—স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র-রচিত "বিধবা-বিবাহ" নাটক। বিধবা-বিবাহের প্রথম আন্দোলনের দিনে ঐ নাটকখানি ঐ বিবাহের পক্ষাবলম্বী সম্প্রদায়কে বড়ই আকৃষ্ট করিয়াছিল। "বিধবা-বিবাহে"র অভিনয়ে ভক্তাবতার কেশবচন্দ্র সেন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেন, বোধ হয়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়চন্দ্রও ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ন্যাশন্যাল ও গ্রেট ন্যাশন্যালে আমরাও দুই-চারি রাত্রি উক্ত নাটকের অভিনয় করিয়াছি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-ধ্যান-পরায়ণ দেশ-সেবক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ রাজনৈতিক লেখক-বীর বলিয়াই জগতে সাধারণের নিকট পরিচিত; কিন্তু শিশিরবাবু সঙ্গীত-বিদ্যা, মল্লবিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যারই আধার ছিলেন। শিশিরবাবুর অস্থি-সার দেহ স্মরণ করিয়া মল্লবিদ্যার নাম শুনিয়া কেহ হাসিবেন না! এক সময়ে তাঁহার শরীরে বিলক্ষণ শক্তি ছিল, আর মনের ভিতর ভীমের পরাক্রম ছিল। চুয়াত্তর সালের কার্ত্তিকের ঝড়ের রাত্রে, ঐ তালপাতার সিপাই একখানা শাল না কম্বল মুড়ি দিয়া যশোহরের একটা মাঠে সমস্ত রাত্রি পড়িয়াছিলেন, বন্ধু-বান্ধবেরা প্রাতঃকালে তাঁহার এই ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিয়াছিলেন যে, কতটা সহ্য করিতে পারেন, তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন।

এদেশে এক সময়ে অনেক বন্দুকধারী শিশিরকে যম দেখিতেন। শিশির-বাবু অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয়, অনেকেই এখন জানেন না। তাঁহার "নয়শো রূপেয়া" নাটক একদিকে যেমন করুণ রসের আধার, অন্য দিকে তেমনি হাস্য-রসের খনি। শিশিরবাবুর সুপরামর্শেই আমরা দেশ-প্রেমোদ্দী-পনকারী 'ভারতমাতা' প্রভৃতি দৃশ্যলীলা অভিনয় করি। বঙ্গীয় তরুণ যুবকগণের প্রাণে দেশাত্মবোধের পবিত্র বীজ প্রথম রোপণ করেন ৺নবকুমার মিত্র ও শিশিরকুমার ঘোষ। বঙ্গে প্রথম প্রকাশ্য নাট্যশালার অভ্যুদয় ঐ সময়েই। শিশিরবাবুর ইঙ্গিতেই হেয়ার স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক হরলাল রায়

"হেমলতা" নামক বীর-রসাশ্রিত ঐতিহাসিক নাটক প্রথম রচনা করেন। হরলালবাবু যখন হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক, তখন আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। বড় ভালমানুষ বলিয়া হরলালবাবুকে বড় ভালবাসিতাম, তাই এই পরিচয় দিলাম, নতুবা আমার মত ছাত্র দেখাইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিন্দা করিবার অধিকার আমার নাই। "হেমলতা"র অভিনয় দর্শককে মাতাইয়া তুলিত। সত্যসখা-রূপে মহেন্দ্র বসুকে আমি যেন এখনও চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি! হরলালবাবু "শকুন্তলা" ও "বেণী-সংহার" ভাষান্তরিত করিয়া "কনকপদ্ম" ও "শত্রু-সংহার" নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু অভিনয়ে তাহা তেমন সাফল্য-লাভ করে নাই। শকুন্তলা মোটেই না! হরলালবাবুর ঘাড়ে ভূত চাপিয়াছিল, নহিলে তিনি শকুন্তলার নাম পরিবর্ত্তন করিতে যান্! ত্রিজগতের সকল সুষমার একত্র সমাবেশ করিয়াও গেটে যে শকুন্তলার নামান্তর নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই, তাহাকে কি না কনক-পদ্ম বলা! এই সভাস্থলে অনেকেই উপস্থিত আছেন, যাঁহারা গৃহে গিয়া স্যাকরা ডাকাইয়া এখনই দশটা কনক-পদ্ম গড়িবার অর্ডার দিতে পারেন, কিন্তু কালিদাস স্বয়ং আসিলেও আর একটি শকুন্তলার সৃষ্টি করিতে পারেন না;—পারেন নাই! তিনি যখন বিক্রমোর্ব্বশী লেখেন, তখন শকুন্তলা লেখার কলম তাঁহার হারাইয়া গিয়াছিল! হরলালবাবু আবার ম্যাক্‌বেথেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন, নাম দিয়াছিলেন, "রুদ্রপাল"। তবে কুমারটুলির হাড়ি-গড়া ভগবান পালের সঙ্গে কাঁসারীপাড়ার পেট্রিয়ট-লেখক কৃষ্ণদাস পালের যে সম্বন্ধ, রুদ্রপালের সঙ্গে ম্যাক্‌বেথেরও সেই সম্বন্ধ! রঙ্গমঞ্চে রুদ্রপালের শিশুপালের দশাই ঘটিয়াছিল। ম্যাক্‌বেথের অনুবাদ করিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

জ্ঞাতিত্ব দূরে থাক, যে ভাষার সহিত দেশের মাত্র কয়জন পুরুষের আফিসি আলাপ, সে ভাষা হইতে যে ভাষা আমাদের জননী-ভগ্নী-বনিতা-দুহিতা ব্যবহার করেন, সেই ভাষায় একখানি অতি-উচ্চশ্রেণীর গভীর নাটক যে কতদূর উৎকৃষ্ট অনুবাদিত করা যাইতে পারে, গিরিশবাবু তাহা ম্যাক্‌বেথ অনুবাদে দেখাইয়া গিয়াছেন। ভবভূতির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে যে, পৃথিবীও বিপুলা কালও নিরবধি, ভবিষ্যতে অন্য কবি ইংরাজি নাটক হইতে বাঙ্গালা অনুবাদের উৎকর্ষ নমুনা দেখাইতে পারেন, কিন্তু এখন সে রাজ্যের সিংহাসন গিরিশবাবুরই অধিকারে।

বঙ্কিমবাবু নাটকাখ্যা দিয়া কোন গ্রন্থই লেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার অনেক উপন্যাসই নাটকের রসসৌন্দর্য্যে, আলাপ-মাধুর্য্যে ও ক্রিয়া-প্রয়োগের অভিব্যক্তিতে অলঙ্কৃত। নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহার প্রায় সকল উপন্যাসই পাঠকের ন্যায় দর্শকের মনও মোহিত করিয়াছে। বঙ্কিমবাবু কেবল সোনা রাখিয়া যান নাই, দানা পর্য্যন্ত গড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন—আমরা নাট্যশালার লোক সেই দানা লইয়া হার গাঁথিয়াছি, বড় জোর মাঝে মাঝে দুই-একখানি ধুক্‌ধুকি ঝুলাইয়া দিয়াছি।

মধুসূদনের "মেঘনাদ" এবং নবীনের "পলাশীর যুদ্ধ" নাট্য-পাকশালায় প্রবেশ করিয়া নূতন ব্যঞ্জনের আকারে চিত্তগ্রাহ্য আহার্য্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে "মেঘনাদ" অতি অল্প লোকেই যথারীতি পাঠ করিতে পারিতেন, অনভ্যস্ত রসনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠে অক্ষম হইয়া সাধারণ লোকে উহার তত আদর করিতেন না। আত্মশ্লাঘা মনে করেন, উপায় নাই; কিন্তু রঙ্গমঞ্চই প্রথমে "মেঘনাদে"র আবৃত্তি সাধারণের পক্ষে সহজ ও সুন্দর করিয়া দিয়াছে। হরলাল রায়ের পর রাজপুতানার ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া প্রথম নাটক লেখেন শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। জ্যোতিবাবুর নাটক ও প্রহসন কয়খানি প্রতিভার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। জ্যোতিবাবু যখন প্রথম প্রেসিডেন্সিতে পড়েন, আমি তখন হিন্দু স্কুলে পড়ি। দুইটী পাঠাশ্রম তখন একই বাড়ীতে; সংস্কৃত কলেজের পৈঁঠার উপর হেয়ার সাহেবের প্রতিমার পার্শ্বে এক একদিন যানের প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতেন, আর আমি রাস্তায় গাড়ীতে বসিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহার রূপ দেখিতাম। তখন আমি কিশোর বালক না হইয়া কিশোরী হইলে আমার কি দশা ঘটিত, কে জানে! যেদিন প্রথম "সরোজিনী" নাটকে বিজয় সিংহ সাজিলাম, সে দিন আমি মনে করিয়াছিলাম, আজ হইতে সেই সুন্দর কবির সঙ্গে আমার একটা নিকট-সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

আর একজন নাট্যকার ছিলেন ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী; নন্দবংশর চেয়ে সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি কয়েকখানি ভাল নাটক তিনি লিখিয়াছিলেন; তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন গীত-রচনায়। তাঁহার আনন্দ-কাননের এক-একটি গান এক-একটি সদ্য-ফোটা ফুল :—

"প্রাণ কি চায় রে কে জানে!
পোড়া মন টেঁকে না এখানে॥"
"শারদ-লতিকাসম ললিত-ললনা কায়।"
"যুবক-যুবতী জাগো যামিনী যে যায় রে॥"

খৃষ্টাব্দ ১৮৭০এর কোটার শেষে বঙ্গের নাট্যপ্রতিভা যেন ঘুমাইয়া পড়িল। যাহা কিছু নাটক-অভিনয় করিবার উপযোগী ছিল, সবই পুরাতন হইয়া গেল, কমলাকান্তের দপ্তর পর্য্যন্ত dramatised হইয়া গেল। অপেরা নাম দিয়া নৃত্য-গীতের শ্রাদ্ধ করিলাম, নাটক আর কেহ লেখে না; ভুল হইয়াছে, লেখে বই কি! মধুসূদনের "মায়া-কাননের' নামের অনুকরণে "ক্যাওড়া-কানন" নাটক এবং বিয়োগান্ত প্রহসন পর্য্যন্ত অভিনয়ের জন্য উপহার পাইয়াছি।

কিন্তু উক্ত প্রহসনের নায়িকার ন্যায় ঐ সকল পড়িয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, অভিনয়ে আর প্রবৃত্তি হয় নাই।

কোন কোন থিয়েটার এমন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল যে, বঙ্গদর্শনখানি dramatise করিয়া একটা test case রুজু করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল, শুনিয়াছি। গিরিশবাবু ইতিপূর্ব্বে "দুর্গেশ-নন্দিনী", "মৃণালিনী", "মেঘনাদ" "পলাশীর যুদ্ধ" dramatise করিয়াছিলেন, "আগমনী", "বিজয়া", "দোললীলা" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্যও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আস্ত নাটক একখানিও এ পর্য্যন্ত লেখেন নাই। একটু বেড়ার মধ্যে বলিয়া যাই যে, দুর্গেশনন্দিনী ও মেঘনাদ dramatised হইয়া প্রথমে অভিনীত হয় Bengal Theatreএ। যতদূর জানি, তাহাতে বোধ হয়, এই দুইখানি পুস্তক নাটকাকারে পরিবর্ত্তনে হাত ছিল তিনজনের; লাটুবাবুর জ্যেষ্ঠবংশধর চিত্র-বিদ্যা-সুনিপুন মন্মথনাথ দেব, নাটোর রাজবংশের কুমার সঙ্গীতশাস্ত্রানুরাগী কৃতবিদ্য আমার সহপাঠী উমেশচন্দ্র রায় ও প্রবীণ নাট্যাচার্য্য বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।

নাটকের এমন অভাব হইল যে, অবশেষে আমরা গিরিশবাবুকে ধরিয়া বসিলাম যে, আপনি নাটক লিখিতে চেষ্টা করুন, উদ্যম নিশ্চয়ই সফল হইবে। গিরিশবাবু অনেক ইতস্ততঃ করিয়া প্রথমে "মায়াতরু" ও "মোহিনী-প্রতিমা" দুইখানি গীতিকাব্য রচনা করিলেন। পরে স্বকপোলকল্পিত গল্প লইয়া

"আনন্দ রহো" নাম দিয়া একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিলেন ; গিরিশবাবু স্বয়ং ও তখনকার সমস্ত উৎকৃষ্ট অভিনেতা ঐ নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু গুণগ্রাহী দর্শকগণের নিকট হইতে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিলেও, টিকিট-ঘরে ঐ নাটকের আদর হইল না। "কেঁদে কেঁদে চল্ মা শ্যামা, আমি তোমার সঙ্গে যাব" প্রভৃতি ঐ নাটকে সন্নিবিষ্ট দু-একটি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত এখন পথ-ভিখারীর মুখে শুনিতে পাই ; কিন্তু নাটকখানি গিরিশ-গ্রন্থাবলীতেই আটক পড়িয়া আছে।

আমরা বড় বিপদে পড়িলাম, কত রকমই পরামর্শ করি, কিছুই হয় না, অবশেষে একদিন ভগবান্ নটনাথ আমার মাথায় কেমন একটা সুবুদ্ধি দিলেন—গিরিশবাবুকে বলিলাম যে, যখন "মেঘনাদের" আশীর্ব্বাদে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও একমুণ্ড রাবণ ষ্টেজে চলিয়া গিয়াছে, তখন যেরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাটকের জন্য লিখিবার কল্পনা আপনার অনেক দিন আছে, সেইরূপ ছন্দেই "রাবণ-বধ" লিখুন। (পূর্ব্বে যাত্রার রাবণ নিজের মুখে ভীষণ মুখোস্ পরিয়া ও নয়টি মুণ্ড চিত্রিত একখানি টানাপাখার মত পদার্থ ঘাড়ে বাঁধিয়া আসরে উপস্থিত হইতেন।) গিরিশবাবু তখন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "সে কি চল্‌বে, লোকে যাত্রা আরম্ভ কর্‌লে, না কি বল্‌বে।" কিন্তু তখনকার উদীয়মান জনপ্রিয় অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র ও গিরিশবাবুর অনুজ হাইকোর্টের উকিল অতুলবাবু আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। সম্মত হইলেন।

গিরিশবাবুর জীবনে তখন এক নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আবাল্যের নাস্তিকের মত ব্যবহার ছাড়িয়া তিনি হঠাৎ যেন একেবারে ভগবৎভক্তি-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন ; মা, মা করিয়া তিনি তখন যেন একেবারে পাগল! বিদ্যারূপিণী স্বয়ং জননী যেন তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া মাত্র তিন সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে "রাবণ-বধ" লিখিয়া দিলেন। অমৃত মিত্র রাবণ, স্বয়ং গিরিশ-বাবু শ্রীরামচন্দ্র। গীতরচনায়, বিশেষ প্রেমভক্তিপূর্ণ গীতরচনায় গিরিশবাবু সিদ্ধহস্ত, তাহার উপর দিব্যশক্তিসম্পন্ন রামতারণ সান্যালের সুর,—অভিনয়ে জয়জয়কার পড়িয়া গেল ; বায়রণের ন্যায় এক প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিরিশবাবু হঠাৎ দেখিলেন, তিনি বঙ্গবিখ্যাত নাট্যকার। তারপর গিরিশবাবু কত নাটক লিখিয়াছেন, কত প্রশংসা পাইয়াছেন। তাহার পরিচয়, আমি তাঁহার সুহৃৎ, শিষ্য ও সহযাত্রী আমার মুখে না শুনিয়া বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করুন। যাঁহার

"চৈতন্যলীলা"র অভিনয় দেখিয়া শ্রীশ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ দেব বলিয়াছিলেন "আসলে নকলে তফাৎ দেখ্‌লাম না"। তাঁহার রচনা কি প্রতিভাপ্রসূত, সে যে সাধনার ফল! ঈশ্বরের অহেতুকী কৃপা-প্রেরিত দৈবদান!

নাটককে শিক্ষাপ্রদ বলিয়া সুখ্যাতি করিলে আমার বুকের ভিতর হইতে কেমন যেন একটা "নীতিবোধ নীতিবোধ" "চারুপাঠ চারুপাঠ" ঢেঁকুর উঠে। যিনি নাটক লিখিতে গিয়া শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা ঝাড়িতে যাইবেন, তিনিই ঠকিবেন। আনন্দ উপভোগ করিতে আসিয়া কেহই Sermonising শুনিতে চান না; কিন্তু প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তির সাহায্যে যিনি নাটক লেখেন, সুশিক্ষার বাণী তাঁহার লেখনী হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। যুবা পুত্র বিদ্যালাভের জন্য বিদেশে যাইতেছেন; যাত্রাকালে বৃদ্ধ পিতা যে তাঁহাকে কয়েকটি উপদেশ দিবেন, ইহা অতি সহজ, সুতরাং পলোনিয়স্ ও লিয়ার্টিস্‌কে সেইরূপ কয়েকটি কথা বলিলেন। কিন্তু এমন ভাবে বলিলেন যে, কেবল লিয়ার্টিস্ একেলা শুনিলেন না, শতাব্দীত্রয় অতীত হইয়া গিয়াছে, আজও লোকে সেই উপদেশ শুনিতেছে, মান্যও করিতেছে।

* * * *

Give every man thine ear, but few thy voice.
Take each man's censure, but reserve thy judgment.

* * * *

Neither a borrower, nor a lender be;
For loan oft loses both itself and friend:
And borrowing dulls the edge of husbandry.
This above all,—to thine ownself be true;
And it must follow, as the night the day,
Thou cans't not then be false to any man.
Farewell: My blessing season this in thee!

উৎকৃষ্ট নাটকের নিপুণ অভিনয় সমাজ-শরীরকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়, ব্যক্তি বিশেষের হৃদয়ে উচ্চতর নবীন ভাবের স্রোত বহাইয়া দেয়। মলিয়রের শ্লেষের জ্বালায় ফ্রান্সের নরনারী এক সময়ে বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অনেক সামাজিক আচার-ব্যবহার বড় মানুষী নহে, সং সাজা মাত্র।

ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী যে সময়ে আপনার প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের দিকে একটু একটু মুখ ফিরাইয়া দেখিতেছে, রামায়ণ-মহাভারত কেবল মুদীর পাঠ্য ও পদীর পিসীর শ্রাব্য নহে বুঝিতেছে, কালী দুর্গা আদির প্রতিমাকে মাটীর ঢেলা বলিলে অপমান হয় মনে করিতেছে, 'মিল-কোম্‌থ্‌-কণ্ঠস্থ' রসনাও হরিনামের মধুর রসাস্বাদনে প্রীতি অনুভব করিতেছে; সেই সময়ে ভগবান্ গিরিশবাবু দ্বারা পৌরাণিক ও প্রেমভক্তি-বিষয়ক নাটকসকল লিখাইলেন। বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও রাজকৃষ্ণ রায়ও ধর্ম্মমূলক নাটক লিখিতে লেখনী ধারণ করিলেন। বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণ-চরিত্র" নবীনের "কুরুক্ষেত্র" "প্রভাসা"দি, শিশিরবাবুর "অমিয়-নিমাই-রচিত" প্রভৃতি পবিত্র গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল; "বঙ্গবাসীতে" সপ্তাহে সপ্তাহে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা হইতে লাগিল। বঙ্গমাতার ইংরাজীশিক্ষিত চিন্তারাজ্যে একটি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। গিরিশবাবুর নাটক কেবল নাটক হিসাবেই বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের উৎকৃষ্ট রত্ন নহে, বাঙ্গালীর ভাবের ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠা।

অনেক নাট্যকবিযশঃপ্রার্থী আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহাদের পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইয়া বলিতেন—"Theatre-ওয়ালারা নিজেরাই নাটক লিখিয়া নাম বাজাতে চায়, বাহিরের লোককে একেবারে field দেয় না।" যাহারা নাট্যশালার জন্য লিখিতে প্রয়াসী এ দেশের নাট্যশালার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাসের সন্ধান লওয়া তাঁহাদের উচিত। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেন যে, থিয়েটার-ওয়ালারা সহজে নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই, অভিনয়োপযোগী ভাল নাটক যখন একেবারে পাওয়া গেল না, তখনই অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা লেখনী-ধারণে বাধ্য হইয়াছিলেন। সার্জ্জেণ্ট ব্যালেন্‌টাইনের ব্যারীষ্টারীর অসাধারণ শক্তির কথা শুনিয়া আমি বরোদার গাইকোয়াড়ের মকদ্দমার বিবরণ একখানি বোম্বাইএর কাগজে পাঠ করিয়া একটা হৃদয়ের আবেগে "হীরকচূর্ণ নাটক" খানি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম বটে—কিন্তু তাহা একটা সাময়িক খেয়াল মাত্র, আর নূতন প্রহসনের অভাবে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন সবার সমক্ষে আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, "আমি আগামী শনিবারে 'চোরের উপর বাটপাড়ী' বলে একখানি নূতন

প্রহসন অভিনীত হইবে, এই বিজ্ঞাপন দিয়া ইরাস্‌ম্যাস্‌ জোন্সের বাড়ী প্লাকার্ড ছাপ্‌বার অর্ডার দিয়া আসিয়াছি ; তুমি ঐ নাম দিয়ে একখানা farce চট্‌ করে লিখে দাও।" তাই দায়ে পড়ে এক সন্ধ্যায় ও অপর দিন সমস্ত মধ্যাহ্ন পরিশ্রম করিয়া "চোরের উপর বাটপাড়ি"খানি লিখিয়াছিলাম। যতদিন বাহিরের নাটক পাইব, ততদিন থিয়েটারের লোকেদের মধ্যে নাটককার হইবেন, এ কথা কেহই মনে করেন না। যত নূতন নাটক অভিনয় করাইতে পারিবেন নাট্যশালার অধ্যক্ষগণের অর্থে ও যশে ততই প্রতিপত্তি বাড়িবে ; সুতরাং গিরিশবাবুর ন্যায় ক্ষিপ্রলেখনী-চালক ও অভিজ্ঞ অধ্যক্ষও তাঁহার নিজের নাটক অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কবির ভাল নাটক পাইলে তাহা গ্রহণে আগ্রহই প্রকাশ করিতেন, বিমুখ কখনই হইতেন না।

মহারাজা স্যর্‌ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকট বঙ্গের নাট্য কতখানি ঋণী, এ কথা অনেকেরই জানা নাই ; কিন্তু তিনি যে নিজে একজন উৎকৃষ্ট নাটক-লেখক ছিলেন, এ কথা বোধ হয়, অনেকেই জানেন না ; "বিদ্যাসুন্দর" নাটক এবং "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" ও "উভয় সঙ্কট" নামক দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন তাঁহার নিজের রচনা। "কৃষ্ণকুমারী" নাটকের গীতগুলিও বোধ হয়, মহারাজেরই রচিত। সেকালে যাহারা গীতে সুর সংযোগ করিতেন, তাঁহারা আপনাদের অভ্যস্ত কোনও হিন্দী-গানের শব্দের সহিত মিলাইয়া বাঙ্গালা পদ রচনা না করিয়া দিলে কেবল ছন্দের উপর সুর বসাইতে পারিতেন না ; সেইজন্য মহাকবি মধুসূদনও নিজের নাটকে নিজে গান রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায়ের মত অক্লান্তকর্ম্মা লেখক বোধ হয়, বঙ্গদেশে আজও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ভাল-মন্দের কথা বলিতেছি না, তবে তিনি সরস্বতীর সেবায় যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটু অধিক বয়সেই রাজকৃষ্ণ গ্রাম্য পাঠশালা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা করিতে আসেন, আর পঁয়তা[illegible] ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন ; সুতরাং পাঠ শেষান্তে গ্রন্থকারের কা[illegible] ব্রতী হইয়া কয় বৎসরই বা তিনি কর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলেন ? কিন্তু ইহারই মধ্যে একদিকে মূল মহাভারতের পদ্যানুরূপ মহাকাব্য, অন্যদিকে "পাঁচপাটা" নামক এক চুট্‌কী রহস্য, এইরূপ কত রকমের কত পুস্তকই না তিনি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল থিয়েটারে অতি

দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়া তাঁহার রচিত "প্রহ্লাদ-চরিত্র" একদিন দর্শকের প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। যখন পৌরাণিক কথা প্রায় পুরাতন হইয়া আসিতেছিল, দর্শকগণ যেন একটু মুখ বদ্‌লাইতে চাহিতেছিলেন সেই সময়ে "ষ্টারের" জন্য "প্রতাপাদিত্য" লিখিয়া পণ্ডিতবর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাঙ্গালার নাট্য-জগতে আর এক যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। ক্ষীরোদবাবু অনেকগুলি নাটক ও উপন্যাস লিখিয়াছেন, এখনও তাঁহার লেখনী মন্দীভূত হয় নাই।

হাসিতে ভুলিয়া যাইতেছে, তাই বুঝি দ্বিজু মনের ব্যথায় মর্ত্তধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল! দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "হাসির গান" আমাদের অক্ষয় সম্পত্তি। পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি ক্রমে ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিব। আনন্দ-দানের ন্যায় দান আর নাই। পুত্র আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে, এই আশায় কত ধনী নিজ জীবন নিরানন্দে যাপন করিয়াও উত্তরাধিকারীর জন্য সম্পত্তি রাখিয়া যান। কিন্তু বিকারের তৃষার ন্যায় ধন-পিপাসার নিবৃত্তি নাই; কয়জন ধনীর পুত্র যথার্থ আনন্দ উপভোগ করিতে পারে? হাসিকা প্রাণতোষিকা, জীবনদায়িকা! যিনি একজনের বিরস অধরেও হাসি ফুটাইতে পারেন, তিনি পুণ্যকার্য্য করেন। দ্বিজু তাহার জাতিকে হাসির একটা নন্দনকানন দিয়া গিয়াছে। বংশপরম্পরায় বাঙ্গালী সেই আনন্দ কাননে প্রবেশ করিয়া মন্দারের সৌগন্ধে প্রাণ পুলকিত করিতে পারিবে। দ্বিজেন্দ্রের নাটকগুলির জীবন জাতীয়-ভাব; আর তার নাটকের এক বিশেষ গুণ—তাহার নাটকে খুব action আছে, সুদক্ষ অভিনেতা তাঁহার কলাশক্তি-প্রয়োগের অনেক সুযোগ ঐ সকল নাটকে পাইয়া থাকেন।

বলিয়াছি, ইতিহাস লিখিতেছি না; মোটামুটি নাট্য-সাহিত্যের কথা এই-খানেই শেষ করিলাম। কিন্তু যে নান্দীমুখ সকল শুভকার্য্যের সূচনায় করিতে হয়, নানা কারণে তাহা আমার উপসংহার কালে করিতে হইতেছে। বঙ্গদেশে নাটক নাগরিক, যাত্রা তাহার পরমপূজনীয় গ্রাম্য জ্ঞাতি,—পূর্ব্ব-পুরুষ। আমি নাট্যব্যবসায়ী, যাত্রার তর্পণ না করিলে আমার অপরাধ হইবে। তবে দুঃখের বিষয় যাত্রা উঠিয়া যাইতেছে; এক্ষণে অধিকাংশ স্থলে যাত্রা বলিয়া যাহা অভিনীত হয়, অধিকারী মহাশয়েরা তাহার নাম দিয়া থাকেন "থিয়েটারী যাত্রা" কস্তু

আমার ন্যায় তাম্রকূটভক্ত মাত্রেই জানেন যে, শুদ্ধ নারিকেলের কলিহুকায় জল ফিরাইয়া তামাক খাইলে যে মজা পাওয়া যায়, রূপাবাঁধান হুঁকায় তাহার কিছুই পাওয়া যায় না, কেমন একটা ধাতব গন্ধ লাগে, মুখের কাছটা যেন ক্লেদপূর্ণ মনে হয়। পরস্পরের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় না থাকিলেও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি বোধ হয় সকল সভ্যজাতির মধ্যে একরূপেই প্রকাশ পায়। আমাদের সেকালের কৃষ্ণযাত্রায় ও ইটালীর অপেরার মধ্যে প্রয়োগ-কলার একটি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইটালীর অপেরায় আরম্ভ হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত বিবিধ লীলায় তরঙ্গায়িত স্বরের একটি প্রভাব থাকে। আমাদের আগেকার যাত্রায়ও ঠিক তাহাই থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, রাখাল বালক, গোপী, দূতী সকলেই স্বরে কথা কহিত, অপেরাতেও তাই, ইউরোপীয় ভাষায় তাহাকে Recitation বলে। যাত্রার একলার গান অপেরার "সোলো" দুইজনে পরস্পরের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বা কথা-কাটাকাটির গান অপেরার "ডুয়েট্"। তিন জনের ঐ অপেরার "ট্রাইও"। যাত্রার চারি "ইয়ারীর" গান অপেরার "কোয়ার্টেট্"। যাত্রার "দোয়ারকি" অপেরার "কোরস্"। সামঞ্জস্যের এই সুন্দর সম্ভার বর্ত্তমান কালে যাত্রার অধ্যক্ষগণ কেন বিসর্জ্জন দিলেন? আমাদের সঙ্গদোষে কি? দুইজনেই ধর্ম্মপথের পথিক, শাক্ত রক্তবস্ত্র, রুদ্রাক্ষ ব্যবহার করেন বলিয়া বৈষ্ণব কি তাঁহার বহির্ব্বাস, তুলসীমালা, তিলকের ভেক্ পরিত্যাগ করেন?

যাহা হউক, যাত্রার পালালেখার সূত্রে বঙ্গদেশে অনেক উচ্চদরের কবির আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে, এবং এখনও কয়েক জন সসম্মানে বিরাজিত আছেন। এই সকল কবিদের মধ্যে এক্ষণে অনেকেই অজ্ঞাতনামা; গোপাল উড়ের "বিদ্যাসুন্দরের" টপ্পার রচয়িতা কে, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ঐ সকল গীতিগুলির বয়স কালের হিসাবে শত বৎসরেরও উপর, কিন্তু দেখিতে এখনও যেন ষোড়শী সুন্দরী। রাধাকৃষ্ণ অধিকারীর "কৃষ্ণযাত্রা" ও কালী হাল্দারের "নলদময়ন্তীর" কবি কে, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু গোবিন্দ অধিকারী যে তাঁহার যাত্রার পদকর্ত্তা নিজেই ছিলেন, তাহা জানি এবং জানিয়া গুরুজ্ঞানে তাঁহার চরণে প্রণাম করি। আমি তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার আত্মীয়দের নিকট পালার পাণ্ডুলিপির জন্য বিস্তর অন্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুই দিতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে অধিকারী মহাশয়ের পুত্রের

সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তিনি পিতৃরচিত কয়েকটী গান শুনাইয়া প্রাণ জুড়াইলেন বটে, কিন্তু পাণ্ডুলিপির বিষয় কিছুই বলিতে পারিলেন না। আহা! যাঁহাদের স্মৃতিতে এখনও পুরাতন যাত্রার গীতিগুলি ম্লানপ্রায় অক্ষরে মুদ্রিত আছে, অল্পদিন পরে তাঁহারা লোকান্তরে গমন করিলে, আমরা কি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইব, তাহা দেশবাসী একদিন বুঝিয়া আক্ষেপ করিবেন। লোকনাথ অধিকারীর "কমলে কামিনীর" গীতগুলিতে না জানি কতই মাধুর্য্য আছে! গিরিশবাবু যখন "কমলে কামিনী" নাটক লিখেন, তখন আমি তাঁহাকে বড় অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, কালীদহে কমলে কামিনীর দৃশ্যে গানরচনা-কালে তিনি প্রাচীন গীতের "এই যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী" এই চরণটি মাত্র রাখিয়া পরের পদগুলি নিজে রচনা করিয়া দিন। প্রাচীন-কবি-ভক্ত গিরিশবাবু ইহাতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু অপর একজনের আপত্তি তাঁহাকে ঐ পন্থা গ্রহণ করিতে নিবৃত্ত করে। ঐ কমলে কামিনীর গীত রচয়িতা ছিলেন, সাধক কবি স্বর্গীয় ঠাকুরদাস দত্ত মহাশয়; বড় আনন্দের কথা দত্ত মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত পৈতৃক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং পৌত্র কিরণচন্দ্র পিতৃ-পিতামহের সম্পত্তির সদ্ব্যবহারে অনেক রসগ্রাহীকে সুখী করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান্ মতিলাল ঘোষ মহাশয়দ্বয় যাত্রার পালা লিখিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। হরিপদবাবুর "জয়দেব" নাটক ও যাত্রার ধর্ম্মবিষয়ক পালাগুলি অতি মনোহর; আর ভূষণদাসের "অভিমন্যু বধের" পালায় অভিমন্যুর দুইটি গান বোধ হয় মতিবাবুর রচিত; ঐ গীত দুইটিতে বীণার কোমল সুরে করুণার কাতর ক্রন্দন যেন অক্ষরে অক্ষরে মিশাইয়া আছে। প্রাচীন অধিকারি-তিরোভাবের পর, যাত্রার অবসন্ন দেহকে সঞ্জীবিত করেন দুইজন; এক সাধক-বৈষ্ণব শ্রীপাদ নীলকণ্ঠ আর ভক্তকবি মতিলাল রায়। মতিলাল রায় ও নীলকণ্ঠ দুই জনেরই কণ্ঠে বীণাপাণি কবিত্ব এবং সঙ্গীত উভয় শক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণ ও গোবিন্দের স্মৃতি স্মরণ করিয়া যে সকল বাঙ্গালী অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের চক্ষের জল মুছাইয়া গিয়াছেন নীলকণ্ঠ। আর সাধারণ যাত্রার অবনতির দিনে মতি রায় মহাশয় নিজের মার্জ্জিত রুচি এবং কবিত্ব শক্তির দ্বারা উহাকে সুসংস্কৃত করিয়া তুলেন। মতিবাবুর পুত্র ধর্ম্মদাসও

পিতৃনাম গৌরবের সহিত রক্ষা করিতেছিলেন; হায়! অকালে কাল তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইল। হরঠাকুর, রাম বসু, ভোলানাথ দাস, এণ্টনি সাহেব, দাশরথি রায় এবং বঙ্গদেশে পূর্ব্বে যে সকল নারীকবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

উপসংহারে আর একটি বিষয় সম্বন্ধে দু' একটি কথা না বলিলে আমার অন্তকার কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে; সেইজন্য আর কয়েক মিনিট কষ্ট দিব। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ বলিয়া এদেশে একটা কথা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। নৈরাশ্যের তাড়নায় যাহার মুখ হইতে একথা প্রথম উচ্চারিত হউক না কেন, এ ধারণা কখনই সত্য হইতে পারে না। যে দুই দেবীকে দশভূজা মহাশক্তির দুই পার্শ্বে সমান আসনে বসাইয়া আমরা পূজা করি, তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ বিবাদ থাকা অসম্ভব। কিন্তু যেমন কোনও কার্য্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে হইলে, একাগ্রমনে সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা সিদ্ধ না হইলে দেব দেবীর নিকটও পূর্ণ প্রসন্নতার বরলাভ করা যায় না। একদিন সরস্বতী আর লক্ষ্মী দুই বোনে এক কমলবনে বসিয়াছিলেন—বাণী বীণা বাজাইয়া ভুবনমোহন সুরে একটি ছন্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন, এক মনে অনেকক্ষণ সেই গীত শ্রবণের পর কমলা বলিলেন—"দিদি, তোমার কাছে বস্‌লে তোমার আলাপ কিছুক্ষণ কাণে শুন্‌লে আর কোনও কাজে মন যায় না, কোথাও উঠে যেতে ইচ্ছা করে না; কিন্তু কি করি, আমি কাছে না দাঁড়ালে ছেলে মেয়েরা যে একমুঠো ভাত পর্য্যন্ত মুখে তুল্‌তে পায় না, এর উপর দণ্ডে দণ্ডে তাদের কত অভাব যে আমায় দেখ্‌তে হয়, আমি হাতে করে না দিলে তারা যে কিছুই পায় না।" সিতাঙ্গী উত্তর করিলেন—"বোন্ হও কিনা, রক্তের টান্, তাই অত আদরের কথা বল্‌ছ।"

লক্ষ্মী। না দিদি, সত্যি; তোমার মুখ থেকে যে জ্ঞানের অমৃত বর্ষণ হতে থাকে, ও সুধা কাণে গেলে কি আর ধন-ধান্যের কথা মনে আসে? তবে আমাদের মর্ত্ত্যের সন্তানগণ ক্ষুৎপিপাসা শীত-তাপ ভোগ-রোগাদি অনুভবশীল দেহ লয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের ত ধনের প্রয়োজন। সেই জন্যই আমায় ছুটোছুটি কর্‌তে হয়।

সরস্বতী। তোমার কথা যদি সত্যি হয় বোন্, ভুবনপালন নারায়ণের বক্ষো-বিরাজিনী তুমি—আমার দুটো কথা যদি তোমার কাণে এতই মিষ্ট লাগে যে, আমার কাছ থেকে উঠে তোমার সন্তানদের কাছে যেতেও ইচ্ছা করে না, তা হ'লে বল দেখি, নরলোকে যে ছেলে-মেয়েরা সতত আমার কাছে বস্‌তে চায়, আমার কথা শুন্‌তে ভালবাসে, তাদের কি অবস্থা?

লক্ষ্মী। কেন?

সরস্বতী। ঐ যে বল্লুম, তুমি লক্ষ্মী, যে ছেলেরা তোমার সেবা একান্ত মনে করে, আমার কাছ থেকে উঠে তাদের খাওয়াতে যেতেও তোমার যখন ইচ্ছা করে না, তখন সামান্য শরীরধারী ছেলে-মেয়েরা আমার কাছ ছেড়ে তোমার কাছে এক মুঠো চাইতে যায় কখন, কেমন করে বল দেখি?

লক্ষ্মী। ঠিক্ ঠিক্, মনে হচ্ছে বটে; ঘেন্নায় মরি! আমি আবার মনে কত্তুম দিদির আদুরে ছেলেদের ঢং দেখে আর বাঁচিনে, দিচ্ছি বল্লে আর তর সয় না, অমনি ছুটে মা'র কোলের কাছে দৌড়ে যায়। জ্ঞানময়ী, তোমার কথা শুনে আজ আমার চোখ্ ফুট্‌লো; আমি ভাঁড়ারে ঢুক্‌বো, চাবি খুল্‌বো, তার পরে এসে হাত তুলে দোবো,—তোমার মোহন মন্ত্র যার প্রাণকে মুগ্ধ করেছে; সে কি এত খিতোনো গুছোনোর জন্য অপেক্ষা কর্‌তে পারে? কিন্তু দিদি, তোমার ছেলেদেরও খিদে তেষ্টা আছে।

সরস্বতী। আছে বৈকি! তবে সব সময়ে তোমার মনে পড়ে না, এই যা আমার দুঃখ। তুমি ঐটুকু বুঝে মনে রাখ্‌লে আমি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা কয়ে বাঁচি।

লক্ষ্মী। দেখ দিদি, তুমি তাদের বলে দিও যে, সকাল সন্ধ্যেটা তোমার কাছে আর দুপুর বেলাটা আমার কাছে থাকে, তাহ'লে আমি তাদের ভাত-কাপড় সব জোগাড় করে দেবো।

সরস্বতী। না দিদি, গাড়ী-ঘুড়ি, গয়না-গাটী অত চায় না। ভাবনা-চিন্তার ল্যাঠা ঘুচিয়ে তারা আমার কাছে বসে থাক্‌তে পারলেই বাঁচে।

তাই আমি বলি, বোকা ছেলেগুলো দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গান-বাজনা, ছবি আঁকা—এতে ত আর তোদের পেট ভরবে না, যা না তোদের মাসীর কাছে, একটু বোস্‌গে না, তা সে বুদ্ধি কি আছে? ততক্ষণ গন্ধর সঙ্গে মিল করাতে 'ছন্দ' লিখ্‌বে কি 'বন্দ' লিখ্‌বে তাই ভাবে।

লক্ষ্মী। তবে উপায়? সেবা করে' ভক্তি করে' আমায় যাঁরা বেঁধে রেখেছে তাদের ফেলে আমি ত আর তোমার বাছাদের ঘরে ঘরে দিয়ে আস্‌তে পারি না? তা ত, বোঝ; এখন কি করি বল দেখি?

সরস্বতী। ভেবে দেখ না।

লক্ষ্মী। তুমি বুদ্ধি দাও।

সরস্বতী। দিইছি

লক্ষ্মী। (একটু চিন্তা করিয়া) হয়েছে, আমায় যারা বড় ভক্তি করে, তাদের বলবো যে আমায় যদি প্রসন্ন করতে চাও, তাহ'লে আমার দিদিরও সম্মান রাখ্‌তে হবে। দিদির সন্তানেরা জ্ঞানের আলোচনাতে জীবন উৎসর্গ করে, আমি তোমাদের ঐশ্বর্য্য দিয়েছি, লক্ষ্মীমন্ত তোমরা, বিদ্যার্থীদের অভাব অনটন তোমাদের ঘোচাতে হবে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান কলাশাস্ত্রাদির সকলের উন্নতিতে পৃথিবীতে অর্থের প্রয়োজন। তোমাদের অর্থের সার্থকতা করতে হবে—বিদ্যা বিস্তারে উৎসাহ দিয়া; ধনীর ঘরে বিদ্যার আদর না থাক্‌লে সে যক্ষের কক্ষ মাত্র হবে, লক্ষ্মীর পূর্ণশ্রী সেখানে প্রকাশিত হবে না।

লক্ষ্মীতে সরস্বতীতে এই চুক্তি হবার পর হইতেই রাজাধিরাজ ও ধনৈশ্বর্য্যশালী নরনারীগণ জ্ঞানের আদরে, বিদ্যার আদরে যত্নবান্‌ হইলেন। সেই রামায়ণ-মহাভারতের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল রাজসভাতেই বিদ্বানের আদর, গুণীর আদর, কবি কলাবিদের আদর। ধনী ও বিদ্বান্‌ পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদর্শন না করিলে কখনই সমাজের সৌষ্ঠব সম্পাদন হইতে পারে না; বড় দুঃখের বিষয়, অধুনা সমাজে একটা বিদ্বেষ-ভাবের তীব্রতা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্ম লইয়া সম্প্রদায়ীর বিদ্বেষ, রাজনৈতিক আন্দোলনে মতভেদের বিদ্বেষ, সমাজে জাতিতে জাতিতে, পল্লীতে

পল্লীতে, গৃহে গৃহে, অহঙ্কারের, মাৎসর্য্যের বিদ্বেষ আর হায় হায়, সাহিত্য-ক্ষেত্রের আধিপত্যের আসন লইয়া পরস্পর বিদ্বেষ। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে ত্রিদিবেও বিদ্বেষ নাই, মর্ত্ত্যেও থাকা উচিত নহে। ধনী যদি পণ্ডিতদের সাদরে, সম্মানে আহ্বান করেন, তবে তিনি কেন দূরে সরিয়া যাইবেন? নিমন্ত্রণ গ্রহণেচ্ছু ধনবান্‌কে পণ্ডিতই বা কেননা সাদরে আহ্বান করিবেন? এই সমাজের নাট্যাভিনয়ে প্রতি অভিনেতারই ভূমিকা আছে; সকলকেই রাজা সাজাইয়া একখানি নাটক গঠিত হয় না, সকলকে কবি সাজাইয়াও একখানি নাটক গঠিত হয় না। ভূমিকায় ছোট বড় নাই; প্রবেশের প্রস্থানের স্থিতি-গতি, ভাব-ভঙ্গী ও বচনোচ্চারণে কলাচাতুর্য্যের পূর্ণতা দেখাইয়া যদি একজন ভৃত্যের ভূমিকায় চারিটী মাত্র কথা কহিয়া যায়, সেই উৎকৃষ্ট অভিনেতা। সে না থাকিলে সেদিন-কার অভিনয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। ঢোলের সঙ্গে কাঁসী বাজে বলিয়াই বাজনা অধিকতর শ্রুতিমধুর হয়; আবার কেবল খানকতক কাঁসী বাজাইলেই আসর হইতে লোক তাড়ান ভিন্ন অন্তরূপ সাফল্য লাভ করা যায় না। আমরা বুড়ী না বসাইয়া চোর চোর খেলিতে আরম্ভ করিয়াছি; পরমেশ্বরকে একপার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া কেবল বই পড়িয়া, কেবল বিদ্যালাভের চেষ্টায় আকৃষ্ট হইয়াছি। তাই অন্তরের উদারবৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে না। মা'র নিকট হইতে দূরে আসিয়া খেলা করিতেছি, তাই ভায়ে ভায়ে বিদ্বেষ, ভাই-বোনে মারামারি! ছেলেরা ঝগ্‌ড়া করিয়া মা'র কাছে যায়, মা একজনকে কোলে বসাইয়া আর একজনের মুখে একটি চুমা খাইয়া, অপরের হাতে সন্দেশ দিয়া ঝগ্‌ড়া মিটাইয়া দেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আজ-কালকার মায়ের সঙ্গেই মকদ্দমা করিতেছে,তা আর মা'র কাছে বিবাদ মিটাইবে কি? মায়ের সঙ্গে যে ছেলে যখন মকদ্দমা করে সে আর তখন মায়ের ছেলে থাকে না; সে হয় তখন বড়বাবু, নয় উকিলবাবু, কি ডাক্তারবাবু, কি মেজকর্ত্তা, কি ছোটকর্ত্তা। মায়ের কাছে ছেলে হইয়া যাইতে হয়, বাবু হইয়া যাইতে নাই। যুধিষ্ঠির গান্ধারীর কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিতে যাইবার সময় দুর্য্যোধনকে উলঙ্গ হইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন; একবার আসুন দেখি, আমরা আমাদের সেই মায়ের কাছে উলঙ্গ হইয়া গিয়া দাঁড়াই, দেহের নগ্নতা নয়, চাতুরী-কপটতা-অহঙ্কার প্রভৃতি পায়জামা-পাগ্‌ড়ি আবা-কাবা ছাড়িয়া, যে মন লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম,

শৈশবের সেই উলঙ্গ মন লইয়া জগন্মাতার পাদপদ্মতলে আত্মনিবেদন করি, দেখুন মা আমাদিগকে তখনই কোলে লইবেন। তাঁহার পদ্মহস্তাবমর্ষণে আমাদের মন হইতে আত্মম্ভরিতা হিংসা-বিদ্বেষ-বৈরিতা এই মুহূর্তেই অপসারিত হইয়া যাইবে।

বঙ্গের সাহিত্যিক মহোদয়গণ! গুরুতর দায়িত্ব আপনাদিগের হস্তে। আপনারা জানেন যে, বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য—তত্ত্বজ্ঞান লাভ, যে জ্ঞানলাভে মানবের ঈশ্বর-দর্শন লাভ হয়, ঈশ্বরের রাজ্যে সেই প্রেমময়, সেই পুণ্যময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে দর্শনী দিতে হয় প্রেম। সেই প্রেম মানব শিক্ষা করিতে পারে প্রথম মানে—আপনার পরিবারবর্গকে ভালবাসিয়া, দ্বিতীয় মানে—আপনার জ্ঞাতি কুটুম্বকে ভালবাসিয়া, তৃতীয় মানে—পল্লীবাসী, চতুর্থ মানে—স্বদেশবাসী এবং পঞ্চম মানে—সমস্ত জগৎকে ভালবাসিয়া; তাহার পরে ষষ্ঠ মানে—ঈশ্বরকে ভালবাসিয়া পাশ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারিব।

স্তাবক হৃদয়ের আকুল আগ্রহে আপনাদিগের পূজা করিতে যাইয়া অতি দীর্ঘ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছি—দেবগণ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না। নটের ও ভাটের একটু বেশী কথা কহিবার অধিকার সকল সভাই দিয়া আসিতেছেন।

শ্রীঅমৃতলাল বসু

দর্শন-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

নমামি সর্ব্বকল্যাণকারণং মোহবারণম্।
সর্ব্বাত্মানং ভবাম্ভোধিতরণিং নিগমারণিম্ ॥
বিদ্যাজন্মান্বয়দ্বন্দ্বহেতবে ভবসেতবে।
গৌতমায় নমো নিত্যমঙ্গিরঃকুলকেতবে ॥

সম্মানভাজন সদস্য ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ !

মনীষিজন-দুর্ব্বহ গুরুভার আমার এই দুর্ব্বল মস্তকে বিন্যস্ত ; স্খলনের আশঙ্কা পদে পদে ; আশা-অবলম্বন, সহৃদয় শ্রোতৃমণ্ডলীর স্থবিরের প্রতি সমবেদনা এবং ভারদাতা সভাকর্ত্তৃপক্ষের উদারতা। সুধীসমাজে বহুভাষণে যেমন ভয়, সুদীর্ঘকাল যে শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছি সেই শাস্ত্রের—সেই দর্শনশাস্ত্রের দুই একটী নূতন কথা শুনাইব, তা ভালই হউক আর মন্দই হইক, নূতন কথা শুনাইব বলিয়া তেমনই উৎসাহ।

এই সাহিত্য-সম্মিলনে দর্শন-শাখার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগ্য সভাপতিগণ যে সব তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত সম্ভবতঃ বহুবিষয়ের সম্বন্ধ এ আলোচনাতেও থাকিবে, তবে সর্ব্বত্রই যে ঐকমত্য থাকিবে এমন আশা করা যায় না। এক্ষণে আমার মতের দোষগুণ বিচারের ভার সুধীশ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি অর্পণ করিয়া প্রকৃত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রকৃত কি—দর্শনের কিঞ্চিৎ আলোচনা। "কিঞ্চিৎ" বলিতেছি কেন—পূর্ণ আলোচনায় আমার শক্তি আছে—সাহস করিয়া এমন কথা বলিতে পারি না, সময় এবং ক্ষেত্রও পূর্ণ আলোচনার অনুকূল নহে।

'দর্শন' শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত এবং সে অর্থের সহিত দর্শন শব্দের সম্বন্ধই বা কি ? এই আলোচনা প্রথমে করিতেছি।

শব্দও অর্থের সম্বন্ধ

শব্দ দুই প্রকার। ধ্বনি ও বর্ণ। ধ্বনি নিরর্থক, বর্ণ বা বর্ণ-সমূহের নামান্তর—পদের অর্থ আছে। এ প্রসঙ্গে আমি অর্থযুক্ত শব্দকেই 'শব্দ' নামে ব্যবহার করিতেছি। শব্দ ও অর্থে অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ; এত ঘনিষ্ট যে কোন সম্প্রদায় অভেদ সম্বন্ধই

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন

দর্শনশাখার সভাপতি

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
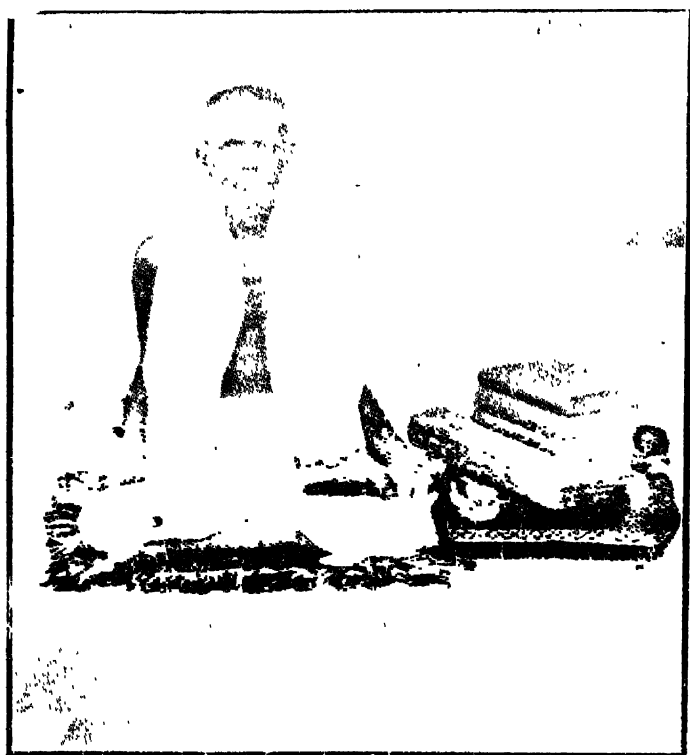
মনে করিতেন, ঘট শব্দ ও ঘট অর্থে কোনই ভেদ নাই। ন্যায়সূত্রে এই মতে দোষ প্রদর্শন আছে। তাহাতে আছে, শব্দ ও অর্থ এক হইলে, অগ্নিশব্দ উচ্চারণ মাত্রে উচ্চারণ-কর্ত্তার কণ্ঠ প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া যাইত। আরও অনেক বিচার আছে। ন্যায়সূত্রকার বলেন—অভেদ নহে শব্দে শক্তি-সম্বন্ধ আছে। শক্তি অর্থে ঈশ্বরের ইচ্ছা। নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরনিষ্ঠ, সকলপ্রকার শিক্ষার মূলে ঈশ্বরকেই দেখিয়াছেন। শব্দ-সঙ্কেত ঈশ্বরেরই কৃত। গো, ঘট, পট এই সকল পদার্থ ঈশ্বরকৃত সঙ্কেতেই বুঝিতে হয়। তবে কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা পারিভাষিক; শাস্ত্রকারগণের প্রদত্ত সঙ্কেতে তাহার অর্থগ্রহণ করিতে হয়। যেমন গুণবৃদ্ধি—পাণিনিকৃত সঙ্কেতে ইহার অর্থগ্রহণ করিতে হয়। ইকার স্থলে একার হইলে গুণ এবং ঐকার হইলে বৃদ্ধি। কতকগুলি শব্দের অর্থ প্রাকৃত বা ব্যাবহারিক সঙ্কেত দ্বারা হইয়া থাকে। 'গাছ' 'মাছ' ইত্যাদি অপভ্রংশ শব্দসমূহ তাহার উদাহরণ। এক্ষণে সংস্কৃত এবং পূর্ব্বে অসংস্কৃত, এমন শব্দও আছে, যথা—পিক, তামরস ইত্যাদি। ইহার অর্থগ্রহণও ঈশ্বরদত্ত সঙ্কেতানুসারে নহে, পূর্ব্বতন অসংস্কৃত শব্দ এখন সংস্কৃতে মিশ্রিত হইলেও তাহার অর্থগ্রহণ সেই পূর্ব্বতন প্রাকৃত সঙ্কেত মতই হয়। শব্দের শক্তি একটী পৃথক্ পদার্থ, শক্তিসম্বন্ধ অর্থে আছে। এ সম্বন্ধ নিত্য। ঈশ্বরকৃতসঙ্কেতস্থলে মীমাংসকগণ তাঁহাদের কল্পিত এই নিত্য সম্বন্ধকেই স্থাপন করেন; কেন না, তাঁহারা ঈশ্বরবাদের বিরোধী। চার প্রকার শব্দের সন্ধান দিয়াছি।

শব্দের শক্তি

(১) শক্তি সম্বন্ধযুক্ত। (২) পরিভাষা সম্বন্ধযুক্ত। (৩) প্রাকৃত সঙ্কেত-যুক্ত অপভ্রংশ। (৪) প্রাকৃত সঙ্কেতযুক্ত সংস্কৃত। দর্শন শব্দ এই চার প্রকার শব্দের মধ্যে কোন প্রকার? আমার বোধ হয়, চতুর্থ প্রকার; দর্শনশব্দ প্রাকৃত সঙ্কেতযুক্ত সংস্কৃত।

দর্শনশব্দ প্রাকৃত সঙ্কেতযুক্ত সংস্কৃত

আমার এ অনুমানের কারণ, ন্যায়শাস্ত্রাদি অর্থে 'দর্শন' শব্দ প্রয়োগ কোন আর্য বা বৈদিকগ্রন্থে নাই। 'দেখা' অর্থে দর্শন শব্দ আছে, নয়ন অর্থেও দর্শন শব্দ আছে, এই দুই দর্শন শব্দ শক্তিসম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু দর্শন বলিতে যে শাস্ত্র

আমরা বুঝি, সেই শাস্ত্রবাচক দর্শন শব্দ আমরা আমাদের মাননীয় গ্রন্থের মধ্যে শারীরক ভাষ্যে প্রথম প্রাপ্ত হই। *

তৎপরবর্ত্তী বহুগ্রন্থেই দর্শনশব্দ আছে, যখন বেদান্তসূত্র দর্শনপর্য্যায়ভুক্ত হয় নাই. তখনকার জৈনগ্রন্থকারের গ্রন্থে কিন্তু দর্শন শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি।

বিদ্যার বিভাগ

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে বিদ্যাকে চারভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) ত্রয়ী (২) বার্ত্তা (৩) দণ্ডনীতি বা রাজনীতি (৪) আন্বীক্ষিকী। কিন্তু দর্শন শব্দ নাই। কৌটিল্য বলিয়াছেন,—'সাংখ্যং যোগং লোকায়তং' এই তিন গ্রন্থ আন্বীক্ষকী। বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে আন্বীক্ষিকী অর্থে ন্যায়শাস্ত্র, ইহা বলা হইয়াছে। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে 'আন্বীক্ষকী' পাঠ মুদ্রিত, বাৎস্যায়ন-ভাষ্যাদিতে পাঠ আন্বীক্ষিকী। আন্বীক্ষকী পাঠও ব্যাকরণানুসারে শুদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু অভিধান প্রভৃতিতে আন্বীক্ষকী পাঠ দেখা যায় না; সর্ব্বত্রই আন্বীক্ষিকী পাঠ আছে। এই কারণে আন্বীক্ষকী পাঠ প্রকৃত কি না, তাহাতে আমি সন্দিহান হইলেও, উভয় শব্দই যে একার্থবোধক, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। বাৎস্যায়নের আন্বীক্ষিকী ও ন্যায়বিদ্যা পর্য্যায়শব্দ। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে ন্যায়ের নামগন্ধও নাই, তবে পর্য্যায়শব্দ হইল কেমন করিয়া—এমন প্রশ্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার উত্তর আছে। আন্বীক্ষিকী বা আন্বীক্ষকী এবং ন্যায়বিদ্যা—উভয়ই যদি পর্য্যায়শব্দ হয়, তাহা হইলে সাংখ্যং যোগং লোকায়তং—সবই ন্যায়বিদ্যা। কেবল গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যাই আন্বীক্ষিকী নহে। এখন আপত্তি হইতে পারে, কৌটিলীয় মতে গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যার উল্লেখমাত্র নাই, অথচ বাৎস্যায়ন গৌতমীয় ন্যায়ের পরিচয় আন্বীক্ষিকী নামেই দিয়াছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে এমন বৈষম্য কেন হয়? ইহার উত্তরে বলা যায়—'যোগং' এই শব্দ বা 'লোকায়তং' এই শব্দ গৌতমীয় ন্যায়বিদ্যা অর্থে ব্যবহৃত। সেশ্বর সাংখ্য বা অধুনা যোগদর্শন বলিয়া

---

* 'ঔপনিষদং দর্শনম্' শারীরক সূত্রভাষ্য ২।১।৯

বৈদিকস্য দর্শনস্য ঐ ঐ ১২।

অসমঞ্জসমিদং দর্শনম্ ২।২।৩৩

এ সব স্থলেও দর্শন শব্দের অন্য অর্থ করা যায় বটে, কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণের মত অনুসারে দর্শন শব্দ এ স্থলে দর্শনশাস্ত্র অর্থে প্রযুক্ত, ইহা বলিতে হইতেছে।

প্রসিদ্ধ পাতঞ্জল দর্শনের যোগ নাম পূর্ব্বে ছিল না, বাৎস্যায়ন যোগমত বলিয়া যে অসৎ উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা ন্যায়-বৈশেষিকের মত, পাতঞ্জল-দর্শনের মত নহে। *

বিদ্যার কথা বহুগ্রন্থে আছে, উপনিষদে প্রথমতঃ দুই বিদ্যার কথা আছে—পরা ও অপরা † যদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, তাহা পরা বিদ্যা (যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে সা পরা—মুণ্ডক ১ম) ও অন্যবিধ বিদ্যা মাত্রই অপরা বিদ্যা। বিদ্যা অন্যত্র চার, চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ প্রকারেও বিভক্ত হইয়াছে। মহাভারত, মনুসংহিতা, বাৎস্যায়ন-কৃত ন্যায়ভাষ্য, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র এবং অমরকোষে বিদ্যা চারভাগে বিভক্ত। ‡ যাজ্ঞবল্ক্য বিদ্যার চতুর্দ্দশ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দ্দশ ও অষ্টাদশ প্রকারে বিদ্যার বিভাগ আছে। সর্ব্ববিধ বিদ্যাবিভাগেই ন্যায়ের স্থান আছে। কোথাও 'বাকোবাক্য' নামে, কোথাও 'আন্বীক্ষিকী' নামে, কোথাও 'ন্যায়বিস্তর' নামে, কোথাও বা কেবল ন্যায় নামই আছে। আর এক-স্থানে অষ্টাদশ বিদ্যা ও সর্ব্ববিধ দর্শনের উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রপঞ্চসার রচয়িতা শ্রীশঙ্করাচার্য্য নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, – কল্পসূত্র-ধৃততাপনী "পরমশিবভট্টারকঃ শ্রুত্যষ্টাদশবিদ্যাঃ সর্ব্বাণি চ দর্শনানি লীলয়ৈব প্রণিন্যে।" শ্রুত্যষ্টাদশবিদ্যার অর্থ বেদপ্রমুখ অষ্টাদশ বিদ্যা, যথা (১) ঋগ্বেদ, (২) যজুর্ব্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) অথর্ব্ববেদ, (৫) শিক্ষা (স্বরশিক্ষা গ্রন্থ), (৬) কল্প (কর্ম্মকাণ্ডের গ্রন্থ), (৭) ব্যাকরণ, (৮) নিরুক্ত (বৈদিক অভিধান), (৯) জ্যোতিঃশাস্ত্র, (১০) ছন্দঃশাস্ত্র, (১১) পুরাণ (১২) ন্যায় (১৩) মীমাংসা (১৪) ধর্ম্মশাস্ত্র (১৫) আয়ুর্ব্বেদ (১৬) ধনুর্ব্বেদ (১৭) গান্ধর্ব্ব (সঙ্গীতশাস্ত্র) (১৮) অর্থশাস্ত্র।

দর্শন অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।

* অসদুৎপদ্যতে উৎপন্নং নিরুধ্যত ইতি যোগানাম্। ন্যায়ভাষ্য ১।১।২৯

† দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি (মুণ্ডক, ১ম অঃ) এতচ্চ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্ (ছান্দোগ্য ৭ অঃ) ইত্যাদীনামুপলক্ষকম্।

‡ আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ (অমরকোষ)। ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্। আন্বীক্ষিকীঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥ (মনু)

পরমেশ্বর পরমশিব এই অষ্টাদশবিদ্যা ও সমস্ত দর্শন লীলামাত্রে প্রণয়ন করিয়াছেন। অষ্টাদশবিদ্যার মধ্যে ন্যায় ও মীমাংসা আছে। অধুনা প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শন এই ন্যায় ও মীমাংসার অন্তর্গত। ন্যায় অর্থে সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও ন্যায়শাস্ত্র, মীমাংসা অর্থে পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনীয় দর্শন ও উত্তরমীমাংসা—বেদান্তদর্শন, ষড়্‌দর্শন ত অষ্টাদশবিদ্যারই মধ্যবর্ত্তী হইল,—তবে আবার সমস্ত দর্শন কি? তাই শঙ্করাচার্য্য তত্রত্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"দর্শনানি বৌদ্ধ-শৈব-ব্রাহ্ম-সৌর-বৈষ্ণবশাক্তানীতি" (প্রাণতোষিণীধৃত)। বৌদ্ধ, শৈব, ব্রাহ্ম, সৌর, বৈষ্ণব ও শাক্ত—এই ষড়্‌দর্শন প্রণয়ন করেন। তাপনী উল্লেখে উদ্ধৃত গ্রন্থ আমাদিগের আলোচিত নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি সপ্তবিধ তাপনীর মধ্যে নাই, আমাদের অপরিদৃষ্ট অন্য কোন তাপনী হইলেও, তাহাতে আমাদিগের ন্যায়, মীমাংসাদর্শন অর্থাৎ পূর্ব্ব ব্যাখ্যামত ষড়্‌দর্শন 'দর্শন' আখ্যায় অভিহিত হয় নাই, যে কয়খানি গ্রন্থ দর্শন আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে, তাহাতেও প্রথমেই বৌদ্ধদর্শনের নির্দ্দেশ।

জৈন-দার্শনিক হরিভদ্রসূরি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, বহু ঐতিহাসিকের মতে তিনি খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে অবস্থিত। তত্ত্বপ্রবোধ-রচয়িতা অপর হরিভদ্রসূরির সময় খৃঃ দ্বাদশশতাব্দী। প্রাচীন হরিভদ্র-সূরি ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের রচয়িতা। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে—বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা। জৈমিনীয়ঞ্চ নামানি দর্শনানামমূন্যহো। বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক ও জৈমিনীয়—এই ছয়খানি দর্শনমত সংগৃহীত; বেদান্ত দর্শনের নাম নাই। মতান্তরে, "নৈয়ায়িকমতাদন্যে ভেদং বৈশেষিকৈঃ সহ। ন মন্যন্তে মতে তেষাং পঞ্চৈবাস্তিকবাদিনঃ। ষষ্ঠদর্শনসংখ্যা তু পূর্য্যতে তন্মতে কিল। লোকায়তমতাক্ষেপাৎ কথ্যতে তেন তন্মতম্।" ন্যায় অর্থে ন্যায় বৈশেষিক ন্যায়েরই অন্তর্গত, অতএব পরলোকবাদী * দর্শন পাঁচখানি, ছয় দর্শন পূর্ণ করিবার জন্য নাস্তিকদর্শন ইহাতে গৃহীত হইয়াছে। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই,—

"সদ্দর্শনং জিনং নত্বা বীরং স্যাদ্বাদদেশকম্।
সর্ব্বদর্শনবাচ্যোঽর্থঃ সংক্ষেপেণ নিগদ্যতে।"

---

* আস্তিক অর্থে পরলোকবাদী।

এই শ্লোকে মহাবীর জিনকে সত্যদর্শন-রচয়িতা বলিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। তাঁহার এই দর্শন যে শাস্ত্র, তাহার পরিচয় ঐ শ্লোকে 'স্যাদ্বাদদেশকম্' এই বিশেষণ দ্বারা সমর্থিত। 'স্যাদ্বাদ' জৈনদিগের দর্শনেই একটী বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক শব্দ। হরিভদ্রসূরি অপেক্ষাও প্রাচীন প্রাকৃত জৈন-সূত্রে এই দর্শন শব্দের উল্লেখ আছে, যথা—

প্রাকৃতে দর্শন শব্দের প্রয়োগ

"ভট্টেণ চরিত্তা উ। দংসণমিহ দিঢ়দরং গহীদব্বং।
সিজ্ঝংতি চরণরহিআ দংসণরহিআ ন সিজ্ঝংতি॥"

আচারভ্রষ্ট হইলেও দর্শনকে—জৈনশাস্ত্রকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবে। আচারহীনেরও সিদ্ধিলাভ হয়, কিন্তু শাস্ত্রত্যাগীর সিদ্ধিলাভ ঘটে না। ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়ের বৃত্তি ও সিদ্ধান্ত এবং বর্ত্তমানপ্রচলিত ষড়্দর্শনের এবং অন্যবিধ ষড়্দর্শনের পরিচয় অনুশীলন করিলে বুঝা যায়—দর্শনকে ছয়প্রকারে বিভাগ বা ছয়খানি করিবার জন্য বহুদিন সমাজে প্রযত্ন ছিল। ষড়্দর্শনের বিভাগ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বা বিভিন্ন সময়ে যেরূপ ছিল—তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ষড়্দর্শনপরিচয়।

বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শন যথা,—
ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত।

অন্যপ্রকার ষড়্দর্শন যথা—

বৌদ্ধ, শৈব, ব্রাহ্ম, সৌর, বৈষ্ণব এবং শাক্ত। (তাপনী)

আর একপ্রকার ষড়্দর্শনের কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন,—যথা,—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগাচার, মাধ্যমিক, জৈন এবং লৌকায়তিক (নাস্তিক)।

ব্রাহ্মণপ্রধান সম্প্রদায়ে এই ষড়্দর্শন 'বেদবাহ্য' নামে অভিহিত। হরিভদ্র-সূরির মতে যে দ্বিবিধ ষড়্দর্শন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

এই যে দর্শনশাস্ত্রকে ছয় সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিবার প্রযত্ন, তাহার তত্ত্ব অদ্বিতীয় গণিতকোবিদ্ ভাস্করাচার্য্যের উক্তি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়—"ষট্তর্কান্ গণিতানি পঞ্চ চতুরো বেদানধীতে স্ম যঃ" ইহা ভাস্করাচার্য্যের আত্মপরিচয়। তিনি ছয়খানি তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; ষট্তর্কই ষড়্দর্শন, ইহা আমাদের ধারণা। ন্যায়, বৈশেষিকপ্রমুখ ছয়খানি তর্কশাস্ত্র উত্তরকালে ষড়্দর্শন আখ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পূর্ব্বে এই তর্কশাস্ত্র বা তর্কবিদ্যার নাম ছিল আন্বীক্ষিকী।

বাৎস্যায়ন ন্যায়বিদ্যা ও আন্বীক্ষিকীকে এক বলিয়াছেন। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাংখ্য, যোগ (বৈশেষিক) লোকায়ত (ন্যায়) তিন শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী নামে কথিত। বাৎস্যায়ন কথিত আন্বীক্ষিকী, গৌতমীয় ন্যায়সূত্র মাত্র নহে, তাহা তাঁহার লিপিকৌশলে বুঝা যায়। তবে গৌতমীয় ন্যায়শাস্ত্রই যে মূল আন্বীক্ষিকী, অন্য শাস্ত্র তাহারই উপদিষ্ট তর্ক অবলম্বন করিয়া আন্বীক্ষিকী নামে পরিচিত, বাৎস্যায়ন-ভাষ্য ও কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে যোগশব্দ আছে, বাৎস্যায়ন-উল্লিখিত যোগই তাহার অর্থ। আমি ন্যায়ভাষ্য-রচয়িতা বাৎস্যায়ন ও কৌটিল্যকে এক ব্যক্তি মনে করি। এক ব্যক্তি না হইলেও পূর্ব্বকালে যে যোগশব্দ বৈশেষিক অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহার প্রমাণ বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে মতান্তর নাই। * বর্ত্তমান সাংখ্য ও যোগদর্শন নামে যে দুইখানি গ্রন্থ প্রচলিত, পূর্ব্বে তাহা সাংখ্য নামেই প্রসিদ্ধ ছিল,—নিরীশ্বর ও সেশ্বর এই দুইটী বিশেষণ দ্বারা অবান্তরভেদ সূচিত হইত, এইমাত্র। প্রাচীন ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে এইরূপ বিভাগই আছে। লোকায়ত—গৌতমীয় ন্যায়শাস্ত্র—লোকয়োঃ আয়তং ইহ ও পরলোকে তাহার বিস্তার অর্থাৎ জ্ঞানফল প্রসারিত, এই কারণে গৌতমীয় ন্যায়ের নাম লোকায়ত ছিল। হরিবংশের প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, গৌতমীয় ন্যায়শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ লৌকায়তিকমুখ্য নামে খ্যাত ছিলেন। † নাস্তিকগণেরও নাম ছিল লোকায়তিক, (লোকঃ আয়তিঃ উত্তরকালো যেষাং লোকায়তিকাঃ; লোকশব্দে দৃশ্যমান, অর্থাৎ ইহলোক ব্যতীত উত্তরকাল যাহারা স্বীকার করে না, পরকালে অবিশ্বাসী) 'লোকায়ত' শব্দও এইভাবের বোধক হইতে পারে (ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়-রচয়িতা ও সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ-রচয়িতা 'লোকায়ত' শব্দ নাস্তিকমত অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন) কিন্তু কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকী মধ্যে যে 'লোকায়ত' শব্দ আছে, তাহা নাস্তিক দর্শন হইতে পারে না। কারণ, ত্রয়ী বিদ্যা প্রভৃতির বলাবল নির্ণয়ে আন্বীক্ষিকীর প্রয়োজন। আন্বীক্ষিকী সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়, এইরূপে যে

* বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ন্যায়সূত্র ১। ১। ২৯

† ঐক্যনানাত্মসংযোগ-সমবায়-বিশারদৈঃ। লৌকায়তিক-মুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতম্ ॥

—হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব।

আন্বীক্ষিকীর গৌরব উদ্‌ঘোষিত, সেই আন্বীক্ষিকীকে বেদবিরোধী ও ধর্ম্মবিরোধী নাস্তিক্যবাদের দ্বারা কলুষিত করিয়া নির্দ্দেশ অসামান্য ধর্ম্মজ্ঞ ও নীতিপরায়ণ কৌটিল্যের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব, তাহা যাঁহারা কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের পূর্ণ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝিতে একটুও আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। যোগশব্দে কেবল বৈশেষিক নহে, বৈশেষিক এবং পূর্ব্বমীমাংসা গ্রাহ্য। কেননা শরীর এবং আত্মার যে বিজাতীয় সংযোগ, তাহা যোগ, ধর্ম্ম সেই যোগসাধ্য বলিয়া বৈশেষিক ও মীমাংসকমতে যোগশব্দের অর্থ ধর্ম্ম। যোগশব্দের আভিধানিক একটী অর্থ উপায়। ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ উপায়, এ কারণেও যোগশব্দের অর্থ ধর্ম্ম হইতে পারে, সেই ধর্ম্মকে অধিকার বা আয়ত্ত করিয়া বৈশেষিক ও মীমাংসাসূত্রাবলী রচিত হওয়াতে, ঐ দুই শাস্ত্র যোগ নামে খ্যাত। * সনাতন-ধর্ম্মী বিদ্বৎসমাজে এই পঞ্চদর্শন আদৃত ছিল, তদ্ভিন্ন বেদবাহ্য দর্শন। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন বেদবাহ্য দর্শনের অন্তর্গত এইরূপে 'ষট্‌তর্ক বিদ্যা' পূর্ণ করা যাইত। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার ষোড়শ দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চদশ দর্শনের সংক্ষিপ্তমত প্রদত্ত হইয়াছে ও শারীরক ভাষ্য-যুক্ত বেদান্তকে 'শাঙ্করদর্শন' নামে সগৌরবে উল্লেখ আছে। সর্ব্বদর্শনকার মাধবাচার্য্যই দর্শনের সংখ্যাধিক্য বিনা আপত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল আলোচনায়, আমরা বুঝিলাম, আমাদের প্রসিদ্ধ শ্রুতি স্মৃতি বা পুরাণে শাস্ত্রবোধক দর্শন-সংজ্ঞা পাই না। কেবল প্রপঞ্চসারকর্ত্তার উদ্ধৃত তাপনীতে—'দর্শন' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাও বৌদ্ধাদি দর্শনের বোধক, প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শনের বোধক নহে। জৈনদিগের পুরাতন গ্রন্থে দর্শনশব্দের উল্লেখ আছে। 'দৃশ্যতে আত্মা যেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি শ্রুতির অনুগত বটে,—কেননা 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' 'এই শ্রুতিতে যে আত্মদর্শনের ব্যবস্থা, আছে, শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার উপায়। জৈমিনীয় দর্শন ও বেদান্তদর্শনে শ্রবণ—ন্যায় বৈশেষিকে মনন বা অনুমান ও সাংখ্য (বিজ্ঞান ভিক্ষুমতে সাংখ্যও মননশাস্ত্র) পাতঞ্জলে নিদিধ্যাসন বা ধ্যানযোগের উপযোগিতা

* যুজ্যেতে আত্মশরীরে যস্মৈ যদর্থং ধর্ম্মায় আত্মশরীরয়োর্যোগঃ ইতি যোগশব্দার্থো ধর্ম্মঃ। তমধিকৃত্য কৃতং শাস্ত্রম্ অত্রার্থে যোগমিত্যৌপচারিকং অর্শ আদিত্বাদচি বা যোগম্। 'অথাতোধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ বৈ……১।১।১। অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। মীঃ ১।১।২।

আছে,—দর্শনহেতু শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের শাস্ত্র বলিয়া ইহা দর্শন নামে অভিহিত হইতে পারে বটে, কিন্তু দর্শন শব্দের ঐরূপ অর্থে ব্যবহার পূর্ব্বাপর নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন যে ছয়খানি দর্শনকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপযোগী বলা হইতেছে, তাহা কোন ঋষিসম্মত গ্রন্থে দর্শন সংজ্ঞায় অভিহিত হয় নাই। আন্বীক্ষিকী, ন্যায়বিস্তর, বাকোবাক্য ইত্যাদি নামেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে বৌদ্ধমতকেও দর্শন বলা হইয়াছে, প্রাচীন ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে নাস্তিকমতকেও দর্শন বলা হইয়াছে, অতএব 'নৈরাত্ম্যবাদ'ও দর্শন। সুতরাং 'দৃশ্যতে আত্মা যেন' আত্মদর্শনের উপযোগী শাস্ত্রই দর্শন, এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বাপর ব্যবহারবিরুদ্ধ, অতএব কাল্পনিক। সাংখ্যদর্শন যে 'স্মৃতি', এ প্রমাণ বেদান্তসূত্রে স্পষ্ট আছে।* আর্য ও তদনুগামী ধার্ম্মিকসম্প্রদায়-মতে "স্মৃতি" কথাটা বড়ই গৌরবের। তদপেক্ষা গৌরবের নাম হইল—শ্রুতি। আমার মনে হয়, বেদবিরোধী-সম্প্রদায় শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেও আপনাদিগের মতকে অধিকতর প্রমাণরূপে প্রসিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারাই 'দর্শন' নাম প্রদান করেন। তাঁহাদিগকে শাস্ত্রকার বলিতে পারি না—এইজন্য তাঁহাদের সঙ্কেত পরিভাষা নহে। ঈশ্বর সঙ্কেতযুক্ত ত নহেই, তাহা হইলে দর্শন শব্দ আর্যগ্রন্থেও ব্যবহৃত থাকিত, কিন্তু তাহা নাই; অথচ দর্শন শব্দটী সংস্কৃত—এই কারণে চতুর্থ পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াছি। দর্শন অর্থে প্রত্যক্ষ, চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণবাদী। এই কারণে চার্ব্বাক-সম্প্রদায়ই প্রথমে দর্শনশব্দের প্রবর্ত্তক, এরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। বেদবিরোধী তর্ক উপলক্ষ্যে দৃশ্‌ ধাতুপ্রয়োগ মনুতেও আছে—যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ যাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলা জ্ঞেয়াস্তমো-নিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ (মনু ১২।৯৫) শ্রুতি-স্মৃতির অনুগামী সম্প্রদায়ের আন্বীক্ষিকী নাম প্রিয় ও প্রকৃষ্ট। স্মৃতি—সংজ্ঞা গৌরবের হইলেও অত্যন্ত ব্যাপক, যাহা অন্বীক্ষা—অনু ঈক্ষা দর্শনের পর অর্থাৎ আগম ও প্রত্যক্ষমূলক—তাহাকে দর্শন নাম প্রদান করা তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গত। তবে দর্শন নাম সাধারণের অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও বিশ্বাসহেতু হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তমতকে 'ঔপনিষদং দর্শনম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর 'আত্মা দৃশ্যতে যেন' এই ব্যুৎপত্তি কল্পিত

* স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্র ২। ১০। ১।

হইল। দর্শন শব্দের যদি প্রাচীন ও নবীন উভয়গত সমন্বয়ে সমর্থ কোন ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয় হয় ত তাহা "দৃশ্যতে নিশ্চীয়তে স্বসিদ্ধান্তো যেন" এই মাত্র হইতে পারে। স্বসিদ্ধান্তবিরোধী মতের খণ্ডন ও স্বসিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন যে শাস্ত্রে আছে এবং স্বসিদ্ধান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই দর্শন—এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাও কাল্পনিক। এরূপ অর্থে দর্শন শব্দের ব্যবহার ত পূর্ব্বে ছিল না। লোকায়তিক নাম নাস্তিকদিগের বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হইলে, নৈয়ায়িকদিগের যেমন ঐ নাম পরিবর্জ্জিত হইল, ন্যায়শাস্ত্রের 'লোকায়ত' নাম পরিত্যক্ত হইল, দর্শন নামের গৌরব ঘোষিত হইল, বেদবাহ্য-প্রদত্ত 'দর্শন' নামও তেমনই ভাষাভাণ্ডারে একটী ব্যাপক স্থান অধিকার করিয়া নৈয়ায়িক প্রভৃতি সকলকেই এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিল। আমার মতে ইহাই দর্শন শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব। দর্শন শব্দ যখন এমন প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছে, তখন গতানুগতিক আমরা সাদরে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতেছি।

আমাদের শাস্ত্রসঙ্গত ধারণা, শাস্ত্রমাত্রেরই দুই মূর্ত্তি, শব্দ ও শব্দাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তেজের সূক্ষ্ম অবস্থা শব্দ, সূক্ষ্ম তেজোমূর্ত্তি শব্দ-দেবতার স্থান স্থূলাতীত ব্রহ্মলোকে। সভাষ্য তর্ক-দেবতাগণও ব্রহ্মলোকে অবস্থিত। যে ঋষি যে দেবতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই ঋষি সেই দেবতার প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া বা স্বয়ং সেই দেবতা শব্দাকারে তাঁহাকে স্থূলজগতে প্রকাশ করিয়াছেন, স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন, এই প্রকার প্রকাশই দর্শনশাস্ত্রের এবং তদীয় আর্যভাষ্যের উৎপত্তি নামে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ। সেই অধিষ্ঠাতৃ দেবমূর্ত্তি হেমাদ্রিনিবন্ধনে ব্রতখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্বৈতদর্শনের দেবমূর্ত্তির উল্লেখ নাই, ইহা প্রণিধান যোগ্য।

দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি।

ষড়্দর্শনই হউক আর ষোড়শদর্শনই হউক, দর্শনশাস্ত্র সংক্ষেপে দুইভাগে বিভক্ত, আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। এই দুই দর্শনেরই মূল বেদে নিহিত। মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি সুখের দিকেই হইয়া থাকে, সেই সুখের সন্ধানে আস্তিকগণ এক দিকে কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, চতুর্ব্বেদের বহুলাংশ এই কর্ম্মবাদে পূর্ণ, ইহা মীমাংসা দর্শনের মূল। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডল, ১৮ সূক্তে বামদেব ঋষির "অয়ং পন্থা

বেদে দর্শনশাস্ত্রের বীজ।

অনুবিত্তঃ পুরাণঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি, গর্ভবাস ও জন্মাদি দুঃখের যে বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ নিবৃত্তির প্রতি আগ্রহের নিদর্শন, তাহাই ন্যায় প্রভৃতি সকল আস্তিক দর্শনের বীজ ও মীমাংসা দর্শনের পোষক। পঞ্চদর্শনে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় নির্দ্দিষ্ট, সেই উপায় প্রবাহে জন্ম-নিবৃত্তিই চরম স্থানে অবস্থিত। নব্য মীমাংসক নিত্য সুখ সাক্ষাৎকারে দুঃখ-নিবৃত্তির অবশ্যম্ভাব দেখাইয়া জন্মনিবৃত্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সেই বামদেব সূক্তে একাত্মবাদ বা সদ্বাদের বীজও নিহিত আছে। যো রজাংসি নির্ম্মমে পার্থিবানি (ঋগ্বেদ—৬ মণ্ডল ৪৯ সূক্তের ১৩ মন্ত্র) ইত্যাদি মন্ত্রে সদসদ্বাদ বা আরম্ভবাদের বীজ আছে। ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮১ ও ১০৫ সূক্তে বিবর্ত্তবাদ ও পরিণাম বাদের ছায়া ও আরম্ভবাদের অভিব্যক্তি আছে। যজুর্ব্বেদ মাধ্যন্দিনীয় শাখা ১৬।২৭।৩২ অধ্যায়ে ঋগ্বেদোক্ত তত্ত্ব পরিস্ফুট। উপনিষদেও তাহা প্রকাশিত। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে তাহা নানাভাবে পল্লবিত ও ও পুষ্পিত। দর্শন শাস্ত্রসমূহ তাহার ফল। নাস্তিকদর্শন বেদোক্ত তত্ত্বের বিপরীত চিন্তার ফল। অতএব বেদ নাস্তিকদর্শনেরও পরোক্ষ মূল।

দর্শনশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত মত

সদ্বাদ, অসদ্বাদ, সদসদ্বাদ, স্যাদ্বাদ ও অনির্বাচ্যবাদ, এই পঞ্চবাদের উপর জগতের দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। একবিধ মায়াবাদ ও পরিণামবাদ এই সদ্বাদের অন্তর্গত। বৌদ্ধ বিবর্ত্তবাদ বা কল্পনাবাদ অসদ্বাদে প্রতিষ্ঠিত। আরম্ভবাদ ও আকস্মিকবাদ সদসদ্বাদে প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত, জৈনগণের সমস্ত তত্ত্বই স্যাদ্‌বাদে প্রতিষ্ঠিত। অন্যবিধ মায়াবাদ অনির্ব্বাচ্যবাদে প্রতিষ্ঠিত। এই সকল বাদের ব্যাখ্যা বাক্যদ্বারাই প্রকাশ করিতেছি। লিখিত আভাষণ এই স্থানেই সমাপ্ত।

(২)

[বাচিক অংশ]

সদ্বাদ প্রভৃতির বেদস্থিত মূল পূর্ব্বে সামান্যতঃ প্রদর্শন করিয়াছি। বিশেষভাবে তাহা পুনঃপ্রদর্শন করিয়া সদ্বাদ ইত্যাদির ব্যাখ্যা করিব।

"গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চ্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।"

(ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১০ম সূক্ত) হইতে দেখা যায়, ইন্দ্রকে সূর্য্যস্বরূপে স্তব আছে, ইন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঋগ্বেদের নানাস্থানে বর্ণিত (১ম মণ্ডল, ১০০ সূক্ত হইতে বিশেষ দ্রষ্টব্য, "মহো দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সম্রাট্" ইত্যাদি) "নরস্ত দেবাঃ" ১ম মণ্ডল, ১০০ সূক্ত ১০ম ঋকে তিনি যে অনন্ত, তাহাও বর্ণিত। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' এই মন্ত্রে ইন্দ্রতত্ত্ব অধিকতর ব্যক্ত। সূর্য্যই যে ইন্দ্র, তাহা নহে, কারণ, "অস্মৈ সূর্য্যাচন্দ্রমসাভিচক্ষে" (১ম মণ্ডল ; ১০২ সূক্ত ২ ঋক্) এইরূপে সূর্য্যকে ইন্দ্র হইতে ভিন্ন এবং তাঁহার আশ্রিত বলিয়া প্রতিপন্ন করা আছে। এই ঋগ্বেদ মন্ত্রার্থ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিবৃত,—'য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়তি' ইত্যাদি (৩ অঃ ৭ ব্রা) যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যকে স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, আদিত্যের অন্তর্য্যামী, আদিত্য যাঁহার শরীর, অথচ আদিত্য তাঁহাকে জানেন না, তিনি আত্মা। ইন্দ্র যে আত্মা ব্রহ্ম, ইহাই ঋগ্বেদে নানা ভাগে প্রকাশিত। 'ইন্দ্রিয়' এই নাম ঋগ্বেদে অনেক স্থানে আছে 'ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো' (৩ মণ্ডল ৩৭ সূক্ত, ৯ ঋক) "তত্ত ইন্দ্রিয়ং" (১ম মণ্ডল, ১০৩ সূক্ত, ১ ঋক্) "ইন্দ্রস্য আত্মনো লিঙ্গম্ ইন্দ্রিয়ং" আস্তিক দার্শনিকগণের এই সিদ্ধান্ত ঋগ্বেদ (১ম মণ্ডল হইতে উদ্ভূত) ঋগ্বেদ তদনুকূল অপর শ্রুতি এবং অনুগত স্মৃতি আত্মবাদ বা একপ্রকার সদ্বাদের ভিত্তি। সদেব সৌম্যেদমিত্যাদি শ্রুতি তাহারই বিকাশ। এই সদ্বাদ একাত্মবাদই, ইহা আচার্য্য শঙ্করের মত। "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" সূত্রভাষ্যে ইহা বিবৃত।

একাত্মবাদ বিবর্ত্তবাদের এক দিক্। রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদী নহেন, অথচ একপ্রকার সদ্বাদী। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চেতন ও অচেতন এবং ঈশ্বর ব্রহ্মেরই স্বরূপ ; ইহাই সংক্ষিপ্ত রামানুজ মত।

"মম দ্বিবা রাষ্ট্রং" "অহং রাজা বরুণো" "অহমিন্দ্রো বরুণঃ" "অহমপো অপিন্বম্" ইত্যাদি ঋগ্বেদ, ৪ মণ্ডল, ৪২ সূক্তে ত্রসদস্যু ঋষির একাত্মজ্ঞান অভিব্যক্ত।

ম্লেচ্ছ পণ্ডিতগণ যে ঋগ্বেদের শেষ ভাগেই দার্শনিক আলোচনার বীজ আছে বলেন, তাহা নহে।

ঋগ্বেদের প্রথম হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই বেদান্তবীজ নিহিত, কেবল বীজ নহে, অঙ্কুরও দেখা যায়। এই বীজ বা অঙ্কুর শব্দ ব্যবহার আমি যে করিতেছি,

তাহা অধ্যেতার ভাবানুসরণ মাত্র। বেদান্ত বীজ যে কেবল অদ্বৈতবাদ, তাহা নহে; শঙ্কর মতে অদ্বৈতবাদ, রামানুজ মতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; নৈয়ায়িক মতে আরোপাদ্বৈতবাদ (আরোপাদ্বৈতবাদ মৎপ্রণীত 'দ্বৈতোক্তিরত্নমালা' গ্রন্থে বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছি) ইত্যাদি সমুদয় দর্শন সিদ্ধান্তই বেদান্তসম্মত। বেদান্ত অর্থে উপনিষৎ। উপনিষদে বিভিন্ন মতেরই ন্যায়তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; তবে ন্যূনাতিরেক আছে, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য। আরোপাদ্বৈতবাদ সদসদ্বাদের অন্তর্গত। সৎ ও অসৎ শব্দ কেবল যে নিত্য ও অনিত্য, এই অর্থে ব্যবহৃত তাহা নহে, ভাব ও অভাব অর্থে বরং সত্য ও মিথ্যা অর্থেও ব্যবহৃত, এইটুকু সর্ব্বদা স্মরণীয়। নৈয়ায়িক মতে যে সদসদ্বাদ তাহা নিত্য ও অনিত্য অর্থে এবং ভাব ও অভাব অর্থে প্রতিষ্ঠিত। ন্যায় মতে প্রাগভাবও কারণ, এই জন্য অসৎ কারণ ন্যায়মত-বিরুদ্ধ নহে; যাহারা কেবল অসৎকেই কারণ বলে, তাহাদের সিদ্ধান্তকেই অসদ্বাদ বলিয়াছি। নৈয়ায়িক প্রাগভাবকে কারণ বলেন, পরমাণু প্রভৃতিকেও কারণ বলেন, সুতরাং সদসৎ উভয়ই কারণ। এইজন্য নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত সদসদ্বাদী। ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল ১২৯ সূক্তে নাসদাসীন্নো সদাসীৎ ইত্যাদি (১ম মন্ত্রে) 'অসদ্বাদ' 'সদসদ্বাদ' 'স্বভাববাদ' ও 'অনির্ব্বাচ্যবাদ' আছে, তবে অর্থভেদও সেই মতভেদের মূল; "তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চ নাস" এই ২য় মন্ত্রের শঙ্করসম্মত ব্যাখ্যানুসরণে 'সদ্বাদ' সমর্থিত হয়। এই সকল মন্ত্রার্থ প্রদর্শন ও তাহার প্রভেদ প্রদর্শনে এক বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে, আভাবনে তাহার আভাস মাত্র প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম।

১। সদ্বাদ – পরিণামবাদ, প্রাচীন মায়াবাদ এবং যোগাচার মত এই সদ্বাদে প্রতিষ্ঠিত। পরিণামবাদী সাংখ্য পক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে, বস্তুর উৎপত্তি বা ধ্বংস নাই, অবস্থান্তর মাত্র হইয়া থাকে। দুগ্ধ দধি ঘৃত এ সমস্তই স্বরূপতঃ এক, গোগণের আহার্য্যাসই দুগ্ধরূপে পরিণত, সেই রূপ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সম্মেলন মাত্র, পৃথিবী প্রভৃতি স্থূল পঞ্চভূতও সূক্ষ্মভূতেরই সমষ্টি, এই বাহ্য বস্তু অন্তঃকরণেরই পরিস্ফুট ছায়া। আমরা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মনে তাহার একটা গঠন করি—সে গঠনের সহিত কৃতি ইচ্ছা-জ্ঞান অহংভাব বিজড়িত থাকে। আমার কার্য্য, আমার প্রবৃত্তি, আমার ইচ্ছা—এই সকল অন্তরের ভাব লইয়া যখন আমাদিগের বহিঃস্থ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তখন জগৎ-

কার্য্যেও ঐরূপ অন্তরের ভাব আছেই, সেই ভাবের আশ্রয় অহঙ্কার ও বুদ্ধি পঞ্চভূতের সূক্ষ্মতম রূপ। বুদ্ধি যখন জ্ঞানপ্রধান কর্ম্মপ্রধান ও জড়তাপ্রধান হয়, তখন ঐ প্রকারত্রয় সম্মেলনই সকলেরই মূল। ঐ যে প্রকারত্রয় উহার শাস্ত্রীয় নাম—সত্ত্ব রজ ও তম। 'গুণ' নামে ইহাদের পরিচয় আছে। সম্মিলিত গুণত্রয়ের নাম প্রকৃতি—যাহা কিছু ভোগ্য, যাহা ভোগ সাধন এবং এই যে ভোগায়তন দেহ এ সমস্তই সেই প্রকৃতিরই অবস্থান্তর মাত্র। প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল, নির্ব্বাণ হইল, সাধারণে মনে করে, যাহা ছিল না তাহাই হইল, যাহা ছিল তাহা বিধ্বস্ত হইল, আলোক ছিল না, প্রদীপে আলোক হইল, প্রদীপ নির্ব্বাণের সঙ্গে আলোক বিলুপ্ত হইল, ইহা সাধারণে মনে করিলেও ইহা ঠিক সত্য নহে। আলোক এক আকারে সূক্ষ্মাকারে ছিল—প্রদীপের আবির্ভাবের সঙ্গে তাহা স্থূলরূপে আবির্ভূত হইল এবং নির্ব্বাণের সঙ্গে তাহা সেই পূর্ব্বতন সূক্ষ্মরূপই প্রাপ্ত হইল।

পরিণামবাদ তিন প্রকার;—সেশ্বর, নিরীশ্বর চেতনসাপেক্ষ এবং চেতন নিরপেক্ষ। পাতঞ্জলে ১ম অর্থাৎ সেশ্বর পরিণামবাদ, সাংখ্যে ২য় এবং প্রতীচ্য বিজ্ঞানের প্রধানাংশে ৩য় মত প্রতিষ্ঠিত। গীতায়—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই বচনে এবং পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনায় সেশ্বর সদ্বাদই বুঝিতে পারা যায়। শারীরক ভাষ্যে—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ২।১।১৪ এই সূত্র ব্যাখ্যা স্থলে এবং 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (১।৪।২৩) সূত্র ব্যাখ্যা স্থলে সদ্বাদেই যে মায়াবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রমাণিত। ব্রহ্ম সৎ। মায়া বা অনাদি অজ্ঞানে সেই ব্রহ্মে জগৎ কল্পিত হইয়া থাকে। রজ্জু, ব্যবহার দৃষ্টিতে সৎ, অজ্ঞানবশতঃ সেই রজ্জুতে সর্প কল্পনা হয়, সেই কল্পিত সর্পের অস্তিত্ব ঐ রজ্জুর অস্তিত্ব হইতে পৃথক্ নহে, ঐ সর্পও বস্তুতঃ রজ্জু হইতে পৃথক্ নহে। এইরূপ ঐ যে ব্রহ্মে কল্পিত জগৎ—উহার অস্তিত্বও ব্রহ্মের অস্তিত্ব হইতে পৃথক্ নহে, জগৎও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। উত্তমরূপে রজ্জু দেখিতে পাইলে, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া বুঝিলে তখন আর ঐ কল্পিত সর্প থাকে না, বিলীন হইয়া যায়—ব্রহ্মদর্শন ঘটিলে জগৎও ঐরূপ আর থাকে না—লয় প্রাপ্ত হয়। এই কল্পিতের উৎপত্তি ও লয় মিথ্যা। মূল-আশ্রয় ব্রহ্মই সৎ—সেই সদ্ভাবেই "ঘটঃ অস্তি"—ঘটও সৎ; সুতরাং এইরূপ বিবর্ত্তবাদও সদ্বাদে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ যোগাচার মতে যে বিবর্ত্তবাদ আছে, তাহা ক্ষণিক বিজ্ঞান ধারায় প্রতিষ্ঠিত, ক্ষণিক বিজ্ঞান

সং—এই ভাবে যোগাচার মতকেও সদ্বাদের আশ্রিত বলা যায়, কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং ধ্বংস থাকাতে উহা প্রাগুক্ত সাংখ্য-পাতঞ্জল পরিণামবাদ ও শারীরক ভাষ্য-দর্শিত বিবর্ত্তবাদের ন্যায় সদ্বাদে প্রতিষ্ঠিত নহে,—যোগাচারের 'সৎ'—ক্ষণিক সৎ। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, ইঁহারাও সদ্বাদী। পরিণামবাদের ন্যায় বিবর্ত্তবাদও সেশ্বর, নিরীশ্বর চেতন সাপেক্ষ ও চেতন নিরপেক্ষ এই তিন প্রকার। বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ সেশ্বর, যোগাচারের বিবর্ত্তবাদ চেতনসাপেক্ষ, মাধ্যমিকের বিবর্ত্তবাদ চেতননিরপেক্ষ। বৌদ্ধ মাধ্যমিক মত অসদ্বাদে প্রতিষ্ঠিত, শূন্য অসৎ—সেই শূন্যেই সংবিত্তি বা অজ্ঞানবশে জগৎ কল্পিত। সর্ব্বকার্য্যের উৎপত্তির মূলে অভাব বর্ত্তমান—বীজ বিধ্বস্ত না করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, এইরূপ বৌদ্ধ সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মতও অসদ্বাদের আশ্রিত। আকস্মিক-বাদী নাস্তিক সম্প্রদায়ের এক শ্রেণী এই অসদ্বাদের অনুগত, বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকারই এক প্রকার অসদ্বাদ। উপনিষদে অসদ্বাদের মূল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার নিন্দাও আছে—

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥"

—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

অসদ্বাদ চেতনসাপেক্ষ ও চেতননিরপেক্ষ। সৌত্রান্তিক বৈভাষিক মত চেতনসাপেক্ষ, নাস্তিকমত চেতননিরপেক্ষ। আরম্ভবাদ সদসদ্বাদে প্রতিষ্ঠিত। আরম্ভবাদও সেশ্বর, নিরীশ্বর, চেতনসাপেক্ষ ও চেতননিরপেক্ষ, এই তিন প্রকার। ন্যায় বৈশেষিকের আরম্ভবাদ সেশ্বর, পূর্ব্বমীমাংসার আরম্ভবাদ নিরীশ্বর চেতন-সাপেক্ষ, নাস্তিক সম্প্রদায়ের স্বভাববাদিশ্রেণীর একাংশ চেতননিরপেক্ষ আরম্ভবাদী। যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল না, সেই বস্তুর উৎপত্তির মূলে যে প্রযত্ন থাকে, তাহাই আরম্ভ, সেশ্বর আরম্ভবাদীর ইহা সিদ্ধান্ত। অপর আরম্ভবাদীরা বলেন, —আরম্ভ অর্থে উৎপত্তিহেতু প্রাথমিক ব্যাপার বা ক্রিয়াই আরম্ভ। উৎপত্তির মূলে যে প্রযত্ন থাকে, তাহা প্রাথমিক প্রযত্ন, প্রযত্ন পরমাত্মা বা জীবাত্মার ধর্ম্ম। ক্রিয়া বা ব্যাপার—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু এবং মনের ধর্ম্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাণু-দ্বয়ে যে সংযোগ, তাহা হইতে দ্ব্যণুক সৃষ্টি, তৎপরে ক্রমে স্থূল স্থূলতর স্থূলতম পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি, সেই সংযোগ পরমাণু ক্রিয়ার ফল। ঈশ্বর-প্রযত্ন সেই পরমাণু

ক্রিয়ার কারণ। ইহা সেশ্বর আরম্ভবাদীদিগের সিদ্ধান্ত। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ পরমাণু দ্বারা ক্রিয়া হয়, ঈশ্বর বা জীবের প্রযত্ন তাহার কারণ নহে। সুতরাং পরমাণু ক্রিয়াই এস্থলে আরম্ভ, জীব বা জীবাত্মার অদৃষ্ট সহকারী কারণ বলিয়া এই আরম্ভ চেতনসাপেক্ষ। ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন নাই। ইহা পূর্ব্ব-মীমাংসার মত। ইহাঁদের আরম্ভবাদ নিরীশ্বর চেতনসাপেক্ষ। স্বভাবতঃ কার্য্য উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর বা অদৃষ্ট ইহার মূলে নাই, অপ্রত্যক্ষ পদার্থ মানিবার প্রয়োজন নাই, এই নাস্তিক মত চেতন-নিরপেক্ষ আরম্ভবাদ। অবয়ব ও অবয়বী এক নহে, অবয়বের কার্য্য অবয়বী দ্বারা হয় না, অবয়বীর কার্য্য অবয়ব দ্বারা হয় না; দৃষ্টান্ত, সূত্র ও বস্ত্র। সীবনকার্য্য বস্ত্র দ্বারা হয় না, পরিধান বা আচ্ছাদন কার্য্য সূত্র দ্বারা হয় না, অতএব ঐ দুই দ্রব্য পৃথক্। বস্ত্র বয়নের পূর্ব্বে সূত্র থাকিলেও বস্ত্র ছিল না, তাহার অস্তিত্ব ছিল না, পূর্ব্বে অসদ্বস্তুর যে উৎপাদন, তাহাই আরম্ভ। সেই উৎপন্ন বস্তু বিধ্বস্ত হয়। তখন তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই অসদুৎপত্তিই আরম্ভবাদের প্রাণ। উৎপাদ্য বস্তু অসৎ হইলেও মূল কারণ সৎ, এইজন্যই আরম্ভবাদ সদসদ্বাদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছি। অবয়ব-সমষ্টিই অবয়বী, ইহা মতান্তর, আরম্ভবাদীরা তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ধূলিরাশি বা ঘট যেমন এক নহে— সূত্রসমূহ ও বস্ত্র সেইরূপ এক নহে। ধূলিরাশির একাংশে আকর্ষণ করুন, যেটুকু ধরিবেন, ততটুকুই পাইবেন, অন্যাংশ নিস্পন্দ থাকিবে; ঘটের কিন্তু একাংশ আকর্ষণ করিলেই ঘটটী আনিতে পারিবেন, সূত্র-সমষ্টির এবং বস্ত্রের পক্ষেও এই ভাব। যে সূত্র বয়ন দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণ হয় নাই; সে সূত্র একগাছি আকর্ষণ করিলে, তাহাই নিকটে আসিবে, প্রস্তুত বস্ত্রের একটী সূত্রের শীর্ষদেশমাত্র আকর্ষণ করিলেও বস্ত্রের আকর্ষণ হইবে। আকর্ষণে যদি সূত্র ছিন্ন হয় অথচ তাহা আর বস্ত্র থাকে না, তখন তাহা ছিন্ন সূত্রমাত্র। আরম্ভবাদের মূল তত্ত্ব এই স্থানে, বিবর্ত্তবাদ বা কল্পিত জগৎ যে সর্ব্বপ্রত্যয়-বিরুদ্ধ, আরম্ভবাদী তাহাও বলিয়া থাকেন।

জৈনগণ কোন বস্তুকেই একান্ত সৎ বা একান্ত অসৎ বলেন না, তাঁহাদিগের মত এই যে, কার্য্যের উপযোগিতাই বস্তুর বস্তুত্ব, কার্য্যসাধনে অসামর্থ্যই অবস্তুত্ব। যদি কোন বস্তু একান্তই সৎ হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু সমানভাবে সর্ব্বদা কার্য্য-সাধনে উপযোগী থাকিবে, ইহা মানিতে হইবে; কিন্তু তাহা ত হয় না। বীজ

আছে, অঙ্কুর ত হয় না, উপযুক্ত কৃষিক্ষেত্রে তাহার বপন হইলে তবে অঙ্কুর হইবে, এক্ষণে সে বীজ ত নিষ্প্রয়োজন অবস্তু। একই বীজ যদি কিছুদিন অবস্তু এবং সময়বিশেষে বস্তু অঙ্কুরোৎপাদক বা কার্য্যসাধনে উপযোগী হয়, তাহা হইলে ঐ বীজকে একান্ত সৎ বলা যাইবে কিরূপে? যাহা অবস্তু, তাহা ত সৎ নহে। যদি বলেন, কেবল বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না, সরস ভূমিও আর একটী কারণ—কারণসমষ্টি ব্যতীত কার্য্য হয় না, এই কারণ বীজ সকল সময় কার্য্যজনক হয় না, তাহা.ত বস্তুত্ব নষ্ট হইবে কেন? ইহার উত্তরে জৈন বলেন, যে বস্তু অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্যসাধক হয়, সে বস্তু অকিঞ্চিৎকর. তাহাকে কার্য্যসাধনে সমর্থ বলা যায় না, অসমর্থই অন্যের অপেক্ষা করে, খঞ্জ ব্যক্তি বিনা অবলম্বনে চলিতে পারে না। অতএব কার্য্য-সাধনসামর্থ্যই বস্তুত্ব, তদভাব অবস্তুত্ব। বীজে যখন দুই দেখিতেছি, তখন তাহাকে একান্ত সৎ বা একান্ত বস্তু বলিতে পারি না। একান্ত অসৎ বা অবস্তুও বলা যায় না, কোন সময়ে ত সেই বীজই অঙ্কুর উৎপাদন অর্থাৎ কার্য্যসাধন করিতেছে, কার্য্যের উপযোগী হইতেছে। একান্ত সৎও নহে, একান্ত অসৎও নহে, অথচ সময়ে সৎ বটে, সময়ে অসৎও বটে। একই সময়ে তাহাকে যদি 'সৎ', 'অসৎ' বলিয়া পরিচয় প্রদানে ইচ্ছা হয় ত তাহা ত ঘটে না, শব্দ প্রয়োগে পৌর্ব্বাপর্য্য আছে, এই ভাব বুঝাইতে হইলে 'অবক্তব্যঃ' বলিতে হয়। এইরূপ ভাবের বাক্যপ্রয়োগ জৈনদর্শনে আছে, তাহা (১) "স্যাদস্তি (২) স্যান্নাস্তি (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ (৪) স্যাদ-বক্তব্যশ্চ (৫) স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ (৬) স্যান্নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ (৭) স্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্যশ্চ" এই প্রকার। ইহা জৈনদর্শনে 'সপ্তভঙ্গী নয়' নামে খ্যাত। এই 'স্যাদ্‌বাদ' সর্ব্বত্রই অবলম্বনীয়। ইহাতেই বস্তুতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব সমস্তই অবস্থিত। ইহার নামান্তর "কথঞ্চিৎ সদসদ্বাদ" খাঁটি সদসদ্বাদ নহে। এই মতে অন্য প্রদত্ত দোষ এই যে, একই বস্তুতে একই সময়ে বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ যুক্তিবিরুদ্ধ। অনির্ব্বাচ্যবাদ বিবর্ত্তবাদের নব্য সংস্করণ। বাচস্পতি মিশ্র এই অনির্ব্বাচ্যবাদ বলিয়াছেন, শ্রীহর্ষ তাহার পুষ্টি বিশেষরূপে করিয়াছেন। মায়া বিশ্বের উপাদান, মায়া যে কি, তাহা বলা যায় না, সৎ কি অসৎ, তাহা নিরূপণ করা যায় না, অনির্ব্বাচ্য-বাদের ইহা একটা আশ্রয়। তদ্ভিন্ন রজ্জুসর্প, শুক্তিরজত, এগুলি যখন সাময়িক ভীতি ও হর্ষ উৎপাদন করিয়া কার্য্যসাধক হয়, তখন একেবারে উহাকে অসৎ

বলা যায় না, বাধ নিশ্চয় হইলে আর কার্য্যোপযোগী থাকে না, এইজন্য সৎও বলা যায় না, এই কারণে উহা অনির্ব্বাচ্য। উপাদান মায়া অনির্ব্বাচ্য, তাহার কার্য্যও কাজেই অনির্ব্বাচ্য—এই অনির্ব্বাচ্যবাদ। আকস্মিকবাদের একটা দিক্ এই অনির্ব্বাচ্যবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দর্শন ছয়ই হউক, আর যোড়শই হউক, স্থূলতঃ তাহা আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। সেই আস্তিক দর্শনেরও দুইটী ভাগ আছে, বৈদিক আস্তিক ও অবৈদিক আস্তিক। যে দর্শনে বেদ প্রামাণ্য স্বীকৃত, তাহা বৈদিক আস্তিক দর্শন, যাহাতে বেদপ্রামাণ্য স্বীকার নাই, তাহা অবৈদিক আস্তিক, যথা জৈন ও বৌদ্ধদর্শনসমূহ। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে বেদ-প্রামাণ্য স্বীকৃত না হইলেও তাহাতে বৈদিক তথ্য বহুল পরিমাণে আছে—নাস্তিক দর্শনে বৈদিক মত একেবারেই উপেক্ষিত। সুতরাং আস্তিক নাস্তিক এই দুই প্রকার ভেদ যেমন দর্শন শাস্ত্রে আছে, তেমনই বৈদিক অবৈদিক এই দুই প্রকার ভেদ স্থূলতঃও বলা যাইতে পারে, ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি বৈদিক দর্শন, জৈন বৌদ্ধ এবং নাস্তিক দর্শন অবৈদিক-দর্শন। আমাদিগের আচার্য্যগণ জৈনদিগকেও অবৈদিক বা বেদবাহ্য বলিয়াছেন। জৈন সূরি হরিভদ্র কিন্তু তাঁহার বেদবাহ্যতা নিরাকরণ গ্রন্থে জৈন দর্শনের বেদবাহ্যতা খণ্ডন করিয়াছেন। সে বিচার এ স্থলে অনাবশ্যক। সাংখ্য ন্যায় প্রভৃতি ষড়্দর্শনের ন্যায় গীতাতেও একটী দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্য ও একাত্মবাদের সমন্বয়ে উদ্ভূত। আমি আমার নূতন দেবীভাষ্যে সেই মত প্রকাশ করিতেছি, যদি জীবনে কুলায় ত গীতার সেই দেবীভাষ্য আপনাদিগকে প্রদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব। নব্য-শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে মনে করেন, গীতায় বেদপ্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, বরং বেদের উপর বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। আত্মমত সমর্থনার্থ তাঁহারা গীতার কতিপয় স্থান উদ্ধৃত করেন,—(১) যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং (২) ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ (৩) যাবানর্থ উদপানে (৪) এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে। কিন্তু চারি স্থানেই বেদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই গীতাতে আছে—যামিমাং এ স্থলে 'বেদবাদরতাঃ' আছে 'বেদরতাঃ' নাই, 'বেদবাদরতাঃ'র বাঙ্গলা ভাব, যাহারা বেদের মর্ম্ম বুঝে না, কিন্তু বেদের দোহাই দিয়া থাকে, ঐ বচনে 'অবিপশ্চিতঃ' থাকাতে এই ভাবটা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(২) 'ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ,' ইহার অর্থ বেদে ত্রৈগুণ্যই বিষয়, বিষয়ী নহে, বেদে বিষয় ও বিষয়ী, ভোগ্য ও ভোক্তা, জড় ও চেতন, এই দুই তত্ত্বের নানা ভাবে আলোচনা আছে—তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্য বিষয় অর্থাৎ ভোগ্য বা জড়—আত্মা বিষয়ী ভোক্তা বা চেতন। হে অর্জ্জুন, তুমি বেদের সেই বিষয় যে ত্রৈগুণ্য, তাহা নহ—তুমি অহং স্থূলঃ অহং সুখী ইত্যাদি ভাবে ত্রিগুণের অভিমানে মজিও না, ত্রিগুণের অভিমান হইতে নিষ্ক্রান্ত হও—কেননা, তুমি যে বিষয়ী, তুমি যে চেতন, তুমি ত বিষয় নহ।

(৩) যাবানর্থ উদপানে ইহার অর্থ এই যে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানাদি করা চলে না, কেবল অঞ্জলি করিয়া জলপান করা যায়, চারিদিক্ হইতে জল তাহাতে সঞ্চিত হইলে বা জলপ্লাবনে তাহা পূর্ণ হইলে তাহাতে যেমন অনেক অধিক প্রয়োজন—অবগাহন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ বিজ্ঞানযুক্ত ব্রাহ্মণের সমস্ত বেদেই অধিকতর প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অধিক জলাগমের পূর্ব্বে উদপানে কেবল জলপান করা চলিত, আর কিছু হইত না, জলাগম হইলে অবগাহনাদিও চলিয়া থাকে। বিজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদের নিকট হইতে সেইরূপ স্বর্গাদি ক্ষুদ্র ফলই প্রাপ্ত হইতেন, ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইতেন না। কিন্তু বিজ্ঞানপ্রাপ্তির পর সেই বেদই তাঁহার ব্রহ্মানন্দ প্রদানে সমর্থ হয়। কর্ম্ম হইতেই যে ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়, গীতাতেই আছে—'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ'।

(৪) ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ এই বচনে 'কামকামাঃ' আছে, যাহারা সকাম ও হীনভাব ত্রয়ীধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করে, গতায়াত করে। 'অনুপ্রপন্নাঃ' এই স্থলে "অনু" হীন অর্থের দ্যোতক। 'ত্রয়ীধর্ম্মং প্রপন্নাঃ' নহে 'অনুপ্রপন্নাঃ'—কেননা 'কামকামাঃ' এই দুইটি কথা হইতেই নিষ্কাম কর্ম্মীর প্রশস্তভাবে ত্রয়ীধর্ম্মসেবা ও মহৎ ফল সূচিত হইয়াছে। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ', "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ", "যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ" ইত্যাদি বহুস্থলেই বিশদভাবে বেদবিধির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত, অতএব গীতা-দর্শন বেদপ্রামাণ্য, বিরোধী ত নহেনই—প্রত্যুত বিশেষভাবে সমর্থক।

এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি আমার গীতা-দেবীভাষ্যে করিয়াছি, প্রাসঙ্গিক কথা আর বাড়াইব না।

এক্ষণে শেষ কথা,—

এই যে সংক্ষিপ্ত দার্শনিক মতসমূহ, মোক্ষে ইহার সমন্বয়। মোক্ষের স্বরূপ ও সাধন লইয়া পরস্পরের যতই মতভেদ থাক, দুঃখ নিবৃত্তি যে সকলেরই সম্মত, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। নাস্তিক চার্ব্বাকও "মৃত্যুরেবাপবর্গঃ' বলিয়াছেন। তবে আস্তিক দর্শনে অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষের জন্য যে সকল বিধিবিধান আছে, তাহা ঐহিক ভোগসুখের অন্তরায়। নাস্তিকমত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—

"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

এমন রোচক উপদেশ সে দর্শনে প্রদান করিলেও দর্শন শ্রেণীতে তাহার স্থান অতি নিম্নে। কারণ, প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ তাঁহারা মানেন নাই, মানিতে পারেন না। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ না মানিলে লোক ব্যবহার চলে না, অতএব তাহা মানিতে হয়, মানিলেই নাস্তিক মত আর টিকিতে পারে না। এই ভাবেই নাস্তিক মত বিধ্বস্ত হইয়াছে। আস্তিক মতের প্রতিষ্ঠায় এবং নাস্তিক্য ও নিরীশ্বরতানিরাকরণে ন্যায়দর্শনের স্থান অতি উচ্চে। ঈশ্বরপরায়ণতা ন্যায়-দর্শনে একটী বিশেষ চিহ্ন। সূত্রকারের "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ মন্ত্রায়ুর্ব্বেদবচ্চ প্রামাণ্যং" ইত্যাদি স্থানে যে ঈশ্বরতত্ত্ব পরিস্ফুরিত "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যাদি মতে ব্যাখ্যান্তর হইলেও সে ঈশ্বরনিষ্ঠতা মন্দীকৃত হয় নাই এই জন্যই—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামাশ্রয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
উপায়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং সেয়মান্বীক্ষিকী মতা॥

এই উচ্চ সম্মান আন্বীক্ষিকীর মস্তকে অর্পণ করা হইয়াছে। ইহাই আমার দর্শন শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই অংশ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার জীর্ণ দেহ ও শুষ্ককণ্ঠে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। লিখিতাংশই মন্ত্রপাঠের ন্যায় আবৃত্তি করিয়া সভার নিয়ম রক্ষা করিলাম। বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্মিলনে দর্শনচর্চ্চা একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গালা দেশ পৃথিবীর দর্শনচর্চ্চার আদিস্থান, সর্ব্বপ্রথম দর্শন-প্রচারক কপিলদেবের গঙ্গাসাগর বেলার আশ্রম, অদ্যাপি সে স্থানে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে কপিলমুনির মেলা হইয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক মহর্ষি গৌতমের আশ্রম মিথিলায়, বৈশেষিকের ভাষ্য টীকা-রচয়িতা শ্রীধরাচার্য্যের বাস রাঢ়দেশে—বৌদ্ধদর্শন ও বেদের চর্চ্চা যে বাঙ্গালায় বহুকাল চলিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ

তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তাহার পর বাঙ্গালায় ন্যায়ের প্রাধান্য বৌদ্ধ-বিজয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, আজও তাহার একেবারে বিলোপ হয় নাই। অতএব বাঙ্গালায় আজ যে দর্শনচর্চ্চা হইতেছে, তাহাতে বাঙ্গালার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষিত হইতেছে। আশা করি, ন্যায়শাস্ত্র রক্ষা দ্বারা সেই গৌরব যেন রক্ষা করিতে সকলেই যত্নশীল হন।

দর্শনচর্চ্চা বাঙ্গালা সাহিত্যে বহুদিন হইতে আছে। যখন গদ্য সাহিত্য বিরল ছিল, তখনও নানা গীতে কানুর কীর্ত্তন ময়নামতীর গীত বা লুইএর গানে দার্শনিকতত্ত্ব আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে, রামপ্রসাদের শক্তি গীতে, ভারতচন্দ্রের আদিরসপূর্ণ কাব্যেও দার্শনিক বিচারের সন্ধান পাওয়া যায়। আর যাঁহার স্মৃতি-পরিপূত এই সাহিত্য-সম্মিলন, সেই নব্য বাঙ্গালা-সাহিত্যের জীবনস্রষ্টা বঙ্কিমের দর্শনালোচনায় বঙ্গদর্শন নাম সার্থক, অতএব সাহিত্য সম্মিলনে বিশেষতঃ সেই সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনে দর্শনের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক, তাহাতেই যথাশক্তি ও যথাবসর এই আলোচনা করিলাম। ইহাতে কাহারও তৃপ্তি হইলে আমি আমার শ্রমসাফল্য বোধ করিব। এই নীরস বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলী এতক্ষণ মনোযোগ করিয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগের শুভকামনা করিতেছি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন
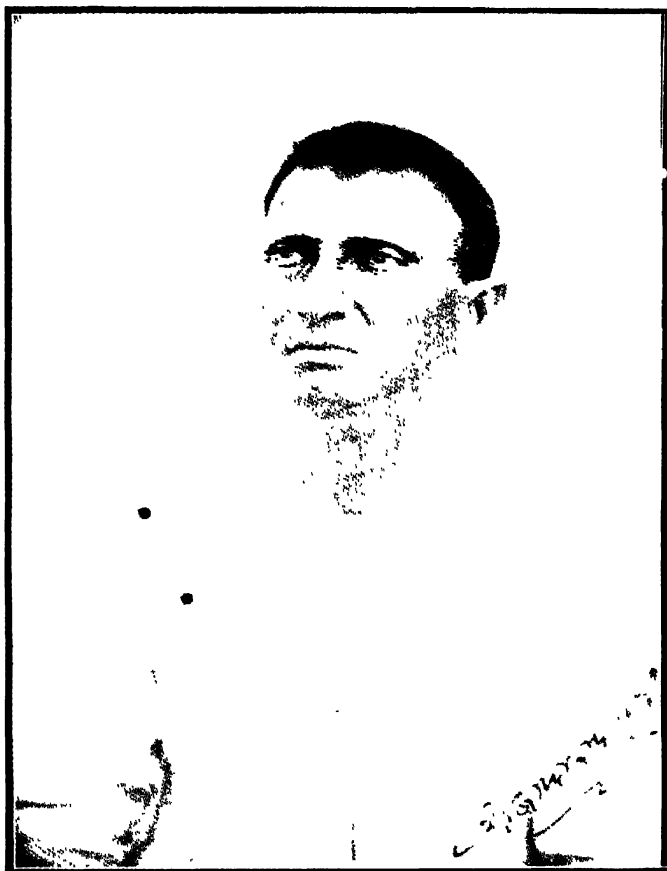
বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বি, এ

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

এবার নৈহাটিতে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, এই খবরটা যখন সংবাদপত্রে পাইলাম, তখন বড় আনন্দ হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম আমাদের গৃহস্থেরা সংসারের জ্বালা ভুলিয়া যে আশায় বুক ভরাইয়া তীর্থযাত্রা করেন, সেই রকম আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভাগীরথী-তীরের এই তীর্থে উপস্থিত হইব, এবং কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া দু'দিন সাহিত্যিকদিগের সদালাপ শুনিব। তারপরে যে স্থানের ইষ্টক-প্রস্তর বঙ্গের কীর্ত্তিমান্ সুসন্তান বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বহন করিয়া আজও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিব। যখনই এই পথে যাতায়াত করিয়াছি, তখনি গাড়ি হইতে উঁকি দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন, বৈঠকখানা ও দোলমঞ্চ বার বার দেখিয়াছি। দুই একবার নৈহাটি ষ্টেশনে নামিয়া একাকী এই স্থানের চারিদিকে কত কি ভাবিতে ভাবিতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। তবে কেন আবার তীর্থদর্শনের ইচ্ছা? আমার মনে হয়, ইহার একটা হেতু আছে। গঙ্গার তীরে অনেক লোকই বাস করেন, তাঁহারা গঙ্গাস্নানও করেন প্রতিদিন—কিন্তু তবুও তাঁহারা পাঁজি-পুঁথি খুঁজিয়া যোগের সন্ধান করেন। এ যোগ কেবল তিথি-নক্ষত্রের যোগ নয়, ইহা হিংসা-দ্বেষ-কলহের তুচ্ছতার উপরে দাঁড়াইয়া মানুষের সহিত মানুষের মিলনের উপলক্ষ্য। তাই মাঝে মাঝে সংসার হইতে দু'দিনের ছুটি লইয়া যোগে আসিবার জন্য মানুষের এত ব্যাকুলতা। আমিও ছুটি লইয়া এই সাহিত্যিক যোগে বন্ধুজনের সহিত মিলিয়া দু'দিন আনন্দে কাটাইব, এই ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু বিধি বাম হইলেন—কয়েক দিন পরেই দুই স্থান হইতে পরওয়ানা আসিল যে, আমাকে এই সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইতে হইবে। সব আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। যে আসন ভুবনবিখ্যাত আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং আমার গুরুস্থানীয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি মনীষিগণ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তাহাতে বসিবার যোগ্যতা সাহিত্যিকগণ আমাতে কোথায় দেখিলেন, তাহা আজও বুঝিতে পারিলাম না। যাঁহারা

বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি হইবার যোগ্য এমন কৃতবিদ্য জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব ও আজ বাংলা দেশে নাই। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণা করিয়া জগতের সর্ব্বত্র আদর পাইতেছেন, এমন সুপণ্ডিত বাংলার নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ অনেকে আছেন। যে দুর্লভ সম্মান আজ আপনারা আমাকে দিলেন, তাহা তাঁহাদেরই প্রাপ্য ছিল। সভাপতির গুরু কর্ত্তব্যভার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অনেক আবেদন-নিবেদন করিলাম। কিন্তু ফল পাইলাম না। তাই নিজের অক্ষমতার বোঝা ঘাড়ে করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কম্পিতহৃদয়ে আজ আপনাদের সম্মুখে আসিয়াছি। আমাকে ক্ষমা করুন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতিকে কিছু বলিতে হয়, এই একটি চিরন্তন রীতি আছে। যাহা পূর্ব্বে বলিলাম, তাহা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেই আমার পক্ষে শোভন হইত। কিন্তু ইহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইবেন না, তাই অতি সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়া আমার কর্ত্তব্য শেষ করিব।

বিদেশে বিজ্ঞানের নানা বিভাগে আজ যে আন্দোলন, যে গবেষণা চলিতেছে তাহার খবর দেওয়া আমার মুখে শোভা পাইবে না। "পিঁড়ায় বসিয়া পেঁড়োর খবর" দেওয়ার আমি পক্ষপাতী নই। এ সম্বন্ধে আপনারা দশজনে যে খবর রাখেন বোধ করি আমি তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প খবরই রাখি। বাহির হইতে দেখিয়া শুনিয়া যাহা বুঝা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় আজ যেমন জগতের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতিকে এমন কি ভৌগোলিক গণ্ডীকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই রকম বিজ্ঞানকেও নানা বিষয়ে নূতন করিয়া পরখ করিবার একটা তাগিদ আসিয়াছে। ইহা মানুষের মন-গড়া তাগিদ নয়, বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে তাহার অণু-পরমাণুতে যে একটা তাগিদ আসে, এ যেন তাহাই। ইহাকে চাপিয়া রাখা সাধ্যের অতীত। তাই যে প্রেরণায় বড় বড় রাজনীতিক সমাজবেত্তা রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারের গোড়াপত্তনে লাগিয়াছেন, আজ-কালকার বিজ্ঞান-বিশারদেরাও যেন তাহারি বশে চলিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। সুদূর আকাশের কোণে জলন্ত নিহারীকারাশি ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কতদিনে কোন্ জগতের সৃষ্টি করিবে, তাহা যেন বলা যায় না, তেমনি দেশবিদেশের মহাপণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় আধুনিক

বিজ্ঞান যে কি আকার গ্রহণ করিবে বলা যাইতেছে না। কিন্তু ইহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই,—কুজ্ঝটিকা কাটিয়া যাইবে; যাহা এখন আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করিতেছে, তাহাই সংহত হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানের দিব্যকান্তি ফুটাইয়া তুলিবে।

সেদিন একখানি বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে আধুনিক জড়তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি রচনা পড়িতেছিলাম। লেখক বোধ করি আমেরিকান। আজ-কালকার গবেষণা আমাদের মতো প্রাকৃত জনকে যে রকম ধাঁধায় ফেলিয়াছে তাহার তিনি একটি সরস বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রকে অঙ্ক কষিয়া দেখাইবার আদেশ দিয়া বোর্ডের কাছে পাঠাইলে তাহার মনোভাব যে রকম হয়, নিত্য-নূতন আবিষ্কারে সাধারণ লোকের মানসিক অবস্থা যেন সেই রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুবোধ বালক বোর্ডে সংখ্যার পর সংখ্যা লিখিয়া যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ কত কি করিয়া যায় এবং মনে ভাবে মাষ্টার মহাশয়ের বইয়ের পাতায় যে উত্তর লেখা আছে, অঙ্কের ফল তাহার সহিত মিলিয়া যাইবে। যদি না মিলে, তবে সে ভাবে অঙ্ক কষিতে ভুল হইয়াছে। এখন যদি মাষ্টার মহাশয় ভ্রূকুটী করিয়া বালকটিকে বলেন, "ওহে বাপু, সেকাল আর নাই। যোগ, গুণ, বিয়োগ, ভাগে এখন অনেক নির্ভুল ভালো ফল পাওয়া যায়।" ইহাতে বালকটির মানসিক অবস্থা কি হয় আপনারা অনুমান করুন। নূতন নিয়ম জানিবার জন্য সে মাষ্টার মহাশয়কে যতই পীড়াপিড়ি করে, তিনি যদি ততই গম্ভীর হইয়া বলেন, "নূতন নিয়ম যে কি, তাহা জানি না, কিন্তু পুরাতন নিয়মে গলদ অনেক।" এই উত্তরে ছেলেটির মাথা ঠিক থাকে কি? বাহিরে থাকিয়া যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের অবস্থা দেখিতেছেন, তাঁহারা এই উদাহরণের ছেলেটির মতোই দিশা-হারা হইতেছেন। এ সম্বন্ধে আমি আর কিছু বলিব না। ইহার প্রকৃত খবর দিতে পারিবেন, আমাদের দেশের উজ্জ্বলরত্ন মহাপণ্ডিত ডাক্তার মেঘনাদ সাহা মহাশয়। জড়তত্ত্বের মূল ব্যাপার লইয়া আজ যে সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছেন, তিনি তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। তিনি আজ বাংলাদেশের এবং ভারতের গৌরব। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের যশোরশ্মির ন্যায় তাঁহার শুভ্র যশঃকৌমুদীতে আজি জগৎ প্লাবিত হইতে চলিয়াছে। তাঁহার সাধনার

ফল তাঁহার মাতৃভাষায় আমরা তাঁহারি কাছে শুনিতে চাহিতেছি। বিজ্ঞানের উচ্চতত্ত্ব সহজ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ইহা খুবই সত্য কথা। কিন্তু কঠিন বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। অনেক উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আজকাল জার্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজি ভাষায় সাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। মনোভাব-প্রকাশে বাংলা ভাষা ঐ সব ভাষার তুলনায় হীন নয়। তাই সাহা মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি তাঁহার গবেষণা-মন্দিরের বাহিরে যে সহস্র সহস্র কৌতূহলী নরনারী প্রতীক্ষা করিতেছে তাহাদিগকে তাঁহার তপস্যার কথা জানাইতে হইবে এবং সেই তপস্যায় যে অমৃত লাভ হইয়াছে তাহার স্বাদ তাহাদিগকে দিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার দেশবাসী ধন্য হইবে এবং তাঁহার সাধনাও সার্থক হইবে। দেশে জগদীশ, প্রফুল্ল, জ্ঞানচন্দ্র ও মেঘনাদের মতো বৈজ্ঞানিক আছেন এবং রবীন্দ্রনাথের মতো জ্ঞানী কবি আছেন, এই বিশ্বাস দেশবাসীর হৃদয়ে যে বলের সঞ্চার করিবে তাহা অন্য উপায়ে সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব। কোনো জাতি যখন উন্নতির পথে যাইতে চাহে তখন এই বল পরম সহায় হয়।

আজ প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে; আমাদের দেশে যেমন পূর্ব্বে সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও দর্শনাদির চর্চ্চা হইত, এ চর্চ্চা কিন্তু সে রকম ভাবে চলে নাই। ইহা সৃষ্টি করিতে জানিত না এবং অধীত বিদ্যাকে যাচাই করিতেও পারিত না। বিদেশের পণ্ডিতেরা প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা কেতাবে পড়িয়া বা পরের কাছে শুনিয়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় পাশ করিয়া উকিল, মোক্তার, হাকিম, কেরাণী বা শিক্ষক হইয়া সেগুলিকে যতদূর সম্ভব ভুলিয়া যাওয়াই ছিল বিজ্ঞানের চর্চ্চা। পরের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা ও গবেষণা করিয়া কোনো তত্ত্ব আবিষ্কার করা যে আমাদের পক্ষে সম্ভব, ইহা গত ষাট বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ চল্লিশ বৎসর আমাদের মনে স্থান পায় নাই। তারপরে বাংলার পূর্ব্বগগনে জগদীশ ও প্রফুল্ল যুগলচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলে আমাদের বিজ্ঞান-আলোচনা যে নূতন পথ ধরিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আজ প্রফুল্ল ও জগদীশচন্দ্রের শিষ্যদের গবেষণা-মূলক প্রবন্ধাদিতে বিদেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর পত্রিকা অলঙ্কৃত এবং "বসু-বিজ্ঞানমন্দিরে" ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে

বহু যুবক গবেষণায় নিযুক্ত। শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহা দেখিলে আশায় বুক ফুলিয়া উঠে। কিন্তু এই আশা পোষণ করিয়াই কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব? ছয় কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে কুড়িজন বা ত্রিশজন যুবক বিদেশে প্রতিপত্তি লাভ করিলে দেশের উন্নতি হয় না। বিজ্ঞানের শিক্ষা যখন আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের অস্থিমজ্জায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন বুঝিব দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা সার্থক হইয়াছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশের যে কোনো বৈজ্ঞানিক পত্রের পাতা উল্টাইলে দেখা যায়, প্রতিমাসেই সেখানকার শত শত লোকে বহু যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া পেটেণ্ট লইতেছে। কেহ চাষের জন্য নূতন সার আবিষ্কার করিয়া, কেহ ফসলের উন্নতি করিয়া, কেহ বা ফসলের কীটনাশের নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া সংবাদপত্রে প্রচার করিতেছে। আমাদের দেশে বৎসরে কত লোকে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া পেটেণ্ট লয় আপনারা তাহা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি? বিদেশে যাঁহারা নিত্য-প্রয়োজনীয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করেন তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী পণ্ডিত নয়। তাঁহারা আমাদেরি দশ জনের মতো চলনসই শিক্ষিত কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক্‌টা তাঁহাদের অস্থিমজ্জায় এমন বসিয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা চোখ খুলিয়া পরখ করিতে জানেন, হাত-পা নাড়িয়া কাজ করিতে পারেন, এবং চিন্তা করিয়া একটা কিছু উদ্ভাবন করিতে পারেন। আমাদের দেশে যতদিন ঐরকম মানুষ তৈয়ারি না হইবে ততদিন বলিব, দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে না। দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই একথা আমি স্বীকার করি না। এখনকার বাংলাভাষাটি এমন সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাহাতে বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয় মোটা-মুটি প্রকাশ করিতে একটুও কষ্ট বোধ হয় না। পরিভাষার অভাবকে আমি বিশেষ প্রতিবন্ধক মনে করি না। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ গঠিত হইয়াছে এবং সাহিত্য-পরিষৎ হইতে নানা সময়ে যে তালিকা বাহির হইয়াছে তাহা হইতে প্রয়োজন মতো শব্দ বাছিয়া গুছিয়া ব্যবহার করিলে কাজ চলিয়া যায়। দরকার হইলে সরল চলিত বাংলায় নিজের মনের মতো শব্দ গড়িয়া লইলেও ক্ষতি হয় না। মূল্যবান সরঞ্জাম দিয়া পরীক্ষা দেখানো দরকার হয় না; কয়েকটা কাচের নল,

ফ্লাকো শিশি, দুটো স্পিরিট ল্যাম্প, কয়েকটা লেন্স্‌, একটা তাপমান যন্ত্র, এই রকম ছোটোখাটো সরঞ্জামে পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা,প্রাণিবিদ্যার মোটামুটি তত্ত্ব বালক-বালিকাদের বুঝানো যায়। তা ছাড়া জলে, স্থলে, আকাশে, ফুলে, ফলে, লতায়-পাতায় শিক্ষার সরঞ্জাম ত স্তরে স্তরেই সাজানো আছে, ব্যবহার করিলেই হয়। বালকবালিকারা কি রকম কৌতুহলী তাহা আপনারা সকলেই জানেন। তাহারা যাহা দেখে তাহার সম্বন্ধে এমন প্রশ্ন করে যে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়। কিন্তু একটু বয়স হইলেই সেই কৌতূহলবৃত্তি আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছ হইতে বিদায় লয়। কেন ইহা হয় জানি না। বোধ হয়, আমরা যে শিক্ষা দিই তাহার চাপ সেই বৃত্তিগুলিকে অঙ্কুরেই নষ্ট করে। যাহাই হউক, স্বাভাবিক কৌতূহলকে জাগাইয়া রাখিয়া বালকবালিকাদের শিক্ষা দিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহা অপূর্ব্ব। আমি গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ছেলেমেয়েদের এই রকম শিক্ষা দিয়া পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি এবং তাহারা শিক্ষাতে আনন্দ পাইয়াছে। আপনারা হয় ত এখন জিজ্ঞাসা করিবেন এই ছাত্রেরা ভবিষ্যতে কি করিয়াছিল? ইহার উত্তরে এই নিবেদন করিতে পারি, দেশের হাজার হাজার ছেলে যাহা করে, উহারা তাহার বেশি কিছু করে নাই। আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া তাহারা কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিল, এবং পরীক্ষা পাশ করার তাড়ায় তাহারা বোধ করি নিঃশ্বাস ফেলারও সময় পায় নাই। তারপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া ও সংসারী হইয়া হয় ত এখন "হা অন্ন হা অন্ন" করিয়া বেড়াইতেছে, কেহ কেহ হয় ত উকিল, ব্যারিষ্টার বা শিক্ষক হইয়া দিন কাটাইতেছে। আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা আছে, এবং প্রত্যেক পাঠশালায় শত শত বালক বিদ্যাশিক্ষার জন্য যায়। তাহারা শুভঙ্করের আর্য্যা মুখস্থ করিয়া সেরকষা, মণকষা, কাঠাকালি, বিঘাকালি শিখুক,—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষায় চোক্ মুখ কান ফোটে, এবং যে শিক্ষায় জ্ঞানলাভের সঙ্গে আনন্দলাভ করা যায় সে শিক্ষা হইতে আমরা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিব কি? বালকবালিকাদের এই প্রকারে বঞ্চিত রাখা কেবল অন্যায় নহে, ইহাকে মহাপাপ বলিয়াই মনে করি। কি প্রকারে আমাদের দেশে এই প্রকার শিক্ষার প্রতিষ্ঠা সম্ভব সে বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই। আপনারা তাহার উপায় চিন্তা করুন। কিন্তু ইহা ঠিক যে, শিক্ষার ভিত্তিকে ঐ প্রকারে

সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারি সহিত শিক্ষাপদ্ধতিকে সুসঙ্গত না করিলে দেশের মঙ্গল নাই।

কেবল দেশের বালকবালিকাদের বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। শ্রমজীবী, চাষী, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বয়স্ক লোকেরাও যাহাতে বিজ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে এবং বিজ্ঞানের নূতন খবরগুলি জানিতে পারে তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন। আজকাল যে সকল দেশে বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক দিক স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, সেখানে এখন লোকশিক্ষার যে কত আয়োজন আছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। দেশের ধনী লোকেরা এবং গবর্ণমেণ্ট ইহার সহায় আছেন। বহু বৈজ্ঞানিক্ ছুটির দিনে বা সন্ধ্যার সময়ে শ্রমজীবী ও চাষীদের আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা করেন। সঙ্গে হয় ত পরীক্ষা দেখাইবার জন্য সামান্য যন্ত্র সিনেমা বা ম্যাজিক লণ্ঠন থাকে। তা' ছাড়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে সহজ গ্রন্থের প্রচার ত আছেই। আমাদের দেশে লোকশিক্ষার এরকম আয়োজন ত বেশি দেখিতে পাই না। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "সায়েন্স্ এসোসিয়েসন্" ভারতে বিজ্ঞানপ্রচারের অনেক সাহায্য করিয়াছে। 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে" উচ্চ অঙ্গের গবেষণার কার্য্য চলিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে গবেষণার কার্য্য ছাড়া ব্যাবহারিক পদার্থবিদ্যা ও রাসায়নীবিদ্যা প্রভৃতি সাধারণ-ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু লোকশিক্ষার ত কোনো আয়োজন দেখি না। কৃতবিদ্য ছাত্র ও অধ্যাপকগণ বৈজ্ঞানিক বিষয় অবলম্বন করিয়া অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণকে ডাকিয়া যদি নিয়মিত উপদেশ দেন তাহাতে দেশে বিজ্ঞানপ্রচারের সাহায্য হইতে পারে। কোন্ প্রণালীতে অতি কঠিন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকেও জনসাধারণের বোধগম্য করা যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাহা সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে একাধিকবার দেখাইয়াছেন। তা' ছাড়া টিন্ডাল কেলভিন্ লবক্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের উচ্চাসন হইতে নামিয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা এই সকল আচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিব না কি? সত্যের প্রচারে আমাদের দেশ কোনো কালে কোনো দেশের পশ্চাতে ছিল না। সত্যের সন্ধান পাইয়া আমাদের দেশের রাজার ছেলে সিংহাসন ছাড়িয়া, ভিক্ষুক তাঁহার

পর্ণকুটীর ছাড়িয়া—ছুটিয়া বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সাধনার ধন জগৎ-বাসীর মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া উপভোগ করিয়াছেন। আজো আমাদের দেশের আউল-বাউল, উদাসী দরবেশ ও ফকিরের দল সত্যের আভাস পাইলে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে না,—নাচে-গানে মাতোয়ারা হইয়া সব ছাড়িয়া সত্য বিলাইতে দশের মাঝে বাহির হন। এই সব আপন-ভোলা ভবঘুরের দলই ত আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অন্তরের ক্ষুধায় অন্ন-জল যোগাইয়া আসিতেছেন। ইহারা মন্ত্রগুপ্তি জানেন না। তপস্যার ফল দুই হাতে বিলাইয়া জীবন কাটাইতেছেন। ভূতের ওঝা ও সাপের ওঝাদের মতো আমাদেরও মন্ত্রগুপ্তি করিলে চলিবে না। যিনি বিজ্ঞানের যে মন্ত্রের সাধনা করিয়া সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিবেন। ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে,—আপনাদের আহ্বানে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে।

দেশে বিজ্ঞান-চর্চ্চার আর একটি উপায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রচার। আমেরিকা ও য়ুরোপের বিজ্ঞানপ্রধান দেশে দেখা যায়, সরকারি, বে-সরকারি কারখানা কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতে করিতে একটু নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইলেই তাহার বিবরণ পুস্তকাকারে দেশের সমস্ত লোকের হাতে পৌঁছায় এবং লোকে সেই সকল আবিষ্কার কাজে লাগায়। আজকাল আমাদের সরকারী কৃষিক্ষেত্রের চাষ-আবাদের ফলের কথা ঐ পদ্ধতি কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রচার করিবার চেষ্টা হইতেছে,—কিন্তু তাহার আয়োজন যথেষ্ট নয়। কৃষকেরা তাহা জানিতে পায় না। কেবল কৃষি-বিভাগ নয়, চিকিৎসা শিল্প প্রভৃতি সকল বিভাগেরই খবর সাধারণের কর্ণগোচর হওয়া প্রয়োজন।

বিজ্ঞান-সম্বন্ধে সহজ ভাষায় লিখিত বাংলা পুস্তকাদির প্রচারও ত আমাদের দেখিতে পাইতেছি না। আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয় আর আমাদের মধ্যে নাই। মাননীয় যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের লেখনী এখন বিষয়ান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত। রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়, বোধ করি, ভাবিতেছেন তাঁহার যাহা বলিবার ছিল বুঝি তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। সুলেখক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের লেখনী এখন মন্থর গতিতে চলিয়াছে। ভূদেব ও অক্ষয়কুমারের যুগের সহিত তুলনা করিলে মনে হয় যেন নব্য-লেখকদিগের বিজ্ঞান-প্রচারের উদ্যম অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আজকালকার বৃহদায়তন মাসিক পত্রগুলির পৃষ্ঠা ইংরাজি

পত্রিকা হইতে গৃহীত আজগুবি বৈজ্ঞানিক সংবাদে ও চিত্রে পূর্ণ থাকে। ইহাতে এক দল পাঠকের মনোরঞ্জন হয়, কিন্তু শিক্ষা হয় না। পদার্থবিদ্যা, রসায়নীবিদ্যা, ভূবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি ভাল পুস্তকও বাংলা ভাষায় নাই। ইহা লজ্জার বিষয় নয় কি? আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যে ভাষায় "অব্যক্তকে" সুব্যক্ত করিয়াছেন, ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর স্বপ্নের কুহেলিকাকে সরাইরা সুষুপ্তের চিন্তার ধারা যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে ভাষায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রাণি-বিদ্যা ও রসায়নীবিদ্যার পরিচয় দিবার পথ দেখাইয়াছেন, তাহাকে কখনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রকাশের অনুপযোগী বলা যায় না। যাঁহারা দেশকে এবং বাংলা ভাষাকে ভালবাসেন, এমন সুপণ্ডিত সুলেখকের অভাব নাই। পাঠকপাঠিকার সংখ্যাও এখন কম নয়। তবে কেন এত নিরুদ্যম? মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের প্রতি যে প্রীতি, যে শ্রদ্ধা লইয়া বর্ণপরিচয় লিখিয়া গিয়াছেন, আপনাদিগকে সেই প্রকারে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সরল পুস্তক লিখিয়া দেশের লক্ষ লক্ষ বালকবালিকা ও অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণকে বিজ্ঞানের সহিত পরিচিত করিতে হইবে। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর দশ বৎসর পূর্ব্বে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া এই বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশনে দাঁড়াইয়া বঙ্গের সুধীবর্গকে যে বিনীত অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, আজ আমি তাহারি পুনরুক্তি করিতেছি,—"আপনারা কৃতবিদ্য, আপনারা জ্ঞানী, আপনারা মনস্বী আপনাদের চেষ্টায় বঙ্গের নব জাগরণ আরব্ধ হইয়াছে। জননী বঙ্গভূমির কীর্ত্তিধ্বজা আপনাদের হস্তে ধৃত রহিয়াছে। আপনাদের নিজের যশোরশ্মি দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইতেছে। কিন্তু বঙ্গজননী আপনাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, বঙ্গভাষা আপনাদের স্নেহ প্রার্থনা করিতেছে, বঙ্গসাহিত্য আপনাদের করুণাপ্রার্থী, বঙ্গের জনসাধারণ আপনাদিগের অন্তেবাসী; আপনাদের সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে। এক্ষণে আপনারা অবতরণ করুন।"

আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করিয়াছি। এখন আর একটি কথা বলিয়া উপ-সংহার করিব। আজকাল আমাদের দেশে অনেক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। এই সকল পত্রের পাঠক সংখ্যা অল্প নয়। বয়স্ক লোক ছাড়া বালকবালিকা ও অন্তঃপুরের মহিলাদের হাতেও এই সকল কাগজ দেখিয়াছি। থাকুক তাহাতে উপন্যাস-কবিতা, সেগুলির খুবই প্রয়োজন আছে,—কিন্তু কাগজের দুই চারি পৃষ্ঠা কি প্রাণিবিজ্ঞান উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য পৃথক্ রাখা

যায় না ? এই প্রকার স্থান নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া যদি সম্পাদকমহাশয়রা দেশের লোককে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পোকা, মাকড়, সাপ, ব্যাঙ্, টিকটিকি, গিরগিটি, পশু-পক্ষী, গাছপালার নাম ও বিবরণ লিখিবার জন্ম অনুরোধ করেন তাহা হইলে একটা বড় কাজ হয়। দেশের লোকে সাড়া দিবেই। চট্টগ্রামে যে সকল মাছ, পাখী, পোকামাকড় দেখা যায়, বীরভূমে তাহার সবগুলি দেখা যায় না, তাহাদের নামও জেলায় জেলায় স্বতন্ত্র। মাছেরা জলাশয়ের কি রকম স্থানে বাস করে, তাহাদের জীবনের ইতিহাসই বা কি, কোন্ পাখী কোন্ সময়ে আমাদের দেশে আসে, কখন চলিয়া যায়, পাখীদের বাসানির্ম্মাণ ও সন্তানপালনের পদ্ধতিই বা কি প্রকার—এসকল তথ্য কি আমরা অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিব না ? কয়েক বৎসর এই প্রকারে গাছপালা ও প্রাণীদের বিবরণ সংগৃহীত হইলে, বঙ্গদেশের উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-সম্বন্ধে সুন্দর পুস্তক রচনার সম্ভব হইবে। আজ পঁচিশ বৎসর মাষ্টারি করিয়া দেখিয়াছি, ছেলে যখন নিজের চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিয়া গুরুমশাইয়ের শরণাপন্ন হয়, তখন তাহাতে আর পদার্থ থাকে না। সে সুবোধ হয়, শান্ত হয়, নিয়মনিষ্ঠ হয়, বাধ্য হয় অর্থাৎ সার্টিফিকেটে যত গুণের তালিকা চায় তাহার সবগুলিই তাহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়,—খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেবল তাহার নিজের উপরে নিজের বিশ্বাস। সে সমস্ত জীবনই গুরুর সন্ধান করিয়া পুঁথি ঘাঁটে, গুরুর নির্দ্দেশ ব্যতীত সে এক পাও চলিতে পারে না। এই প্রকার গুরুশিষ্য-ব্যাপার সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন অপকার করে, বিজ্ঞান-জগতে ঠিক সেই রকমই অপকার করিয়াই আসিয়াছে। ইংরাজ বৈজ্ঞানিক হক্সলি এক সময়ে বলিয়াছিলেন,—"Science Commits suicide when it adopts a creed।" তাই বলিতে চাই, যাঁহারা আমাদের দেশের প্রাণিবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবেন, তাঁহাদিগের ডারুইন ওয়ালেস্ বা মেণ্ডেলের মতবাদ-সম্বন্ধে খোঁজ লইবার প্রয়োজন নাই এবং রক্সবরা, হিউম, ডিওয়ার ও জর্ডানের পুঁথিতে কি লেখা আছে তাহাও দেখিবার দরকার নাই। সূক্ষ্ম-দর্শনে যাহা চোখে পড়ে তাহাই লিপিবদ্ধ হউক। চোখ খুলিয়া প্রকৃতিকে দেখাই বিজ্ঞানের প্রথম শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হইলে যে ফল পাওয়া যাইবে তাহা অতুলনীয়।

শ্রীজগদানন্দ রায়

ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ

বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ-সাহিত্য-সম্মিলন

ইতিহাস-শাখার সভাপতি

ডাক্তার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

এম্ এ, বি এল, পি এচ্ ডি, পি আর এস

শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি মহাশয়,

সমবেত সাহিত্যসেবী ও

সাহিত্যানুরাগী ভদ্রমহোদয়গণ,

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত পবিত্র ভূমিতে আজ সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন। বাঙ্গালা ভাষাভাষী প্রত্যেক বাঙ্গালীর,—কি সাহিত্যসেবী, কি সাহিত্যানুরাগী,—সকলেরই আজ পরম আনন্দের দিন! এই আনন্দের দিনে বর্ত্তমান সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে ইতিহাস শাখার সভাপতির গৌরবময় পদে অভিষিক্ত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সম্মিলনের পঞ্চম বৎসরে, স্বতন্ত্রভাবে মাত্র বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন হয়। তারপর ১৩২০ সালে, যখন কলিকাতায় সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়, সেই সময় সাহিত্য-সম্মিলন,—সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন এই চারি শাখায় বিভক্ত হইয়া, মূল সভা ব্যতীত চারিটি স্বতন্ত্র শাখা-সভার অধিবেশন হয়। এই হিসাবে বর্ত্তমান বৎসরে, ইতিহাস শাখার অষ্টম অধিবেশন হইতেছে।

আজ যেখানে দণ্ডায়মান হইয়া, আমি আপনাদিগকে সম্বোধন করিতেছি,—জাহ্নবী-সলিল-সিক্ত এই পুণ্য ভূমির অনতিদূরে, রেলওয়ে লাইনের অপর ধারে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবাস-ভবন, বাঙ্গালীর সাহিত্য-সাধনার মহাপীঠ। এই মহাপীঠে উপস্থিত হইয়া একদিন বাঙ্গালার সাহিত্যরথিগণ বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে সাহিত্য-যজ্ঞের বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার প্রায় সমস্ত সুযোগ্য সহকর্ম্মিগণের তিরোভাব ঘটিয়াছে; কিন্তু সে যজ্ঞের হোমশিখা, বাঙ্গালার সহিত্যাকাশকে এখনও উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। কাঁঠালপাড়ার দক্ষিণে, বাঙ্গালার দ্বিতীয় নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী অবস্থিত,—কত স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, দার্শনিক, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া এই পল্লী বহুকাল হইতে বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিতেছে। তারপর, এই মণ্ডপের উত্তরভাগে অবস্থিত গরিফা পল্লীতে, বঙ্গের সেই সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, বঙ্গমাতার সুসন্তান, ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। আর ইহারই কিছু উত্তরে, হালিসহর গ্রাম, বাঙ্গালার সাধক-কবি রামপ্রসাদের পবিত্র জন্মভূমি। এই হালিসহরকে মুখরিত করিয়াই, একদিন তাঁহার অমর সঙ্গীত বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার

প্রাণে শান্তি-সুধা বর্ষণ করিবার জন্য উদ্গীত হইয়াছিল। এই সমস্ত মধুর স্মৃতি-ভরা কাহিনী বর্ত্তমান সভাক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বকে মধুময় করিয়া গিয়াছে।

১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই সময়ে কাঁঠালপাড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" বাহির হয়। এই "বঙ্গদর্শনেই" তিনি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইতিহাস লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন। এ প্রবন্ধগুলি প্রত্যেক ঐতিহাসিকের অবশ্যপাঠ্য এবং আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অমূল্য সম্পৎ। এই ইতিহাসের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বঙ্গদেশ ও বঙ্গবাসীগত-প্রাণ, ইতিহাস-প্রিয় বঙ্কিমচন্দ্র, একদিন উদাত্ত কণ্ঠে যে বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া, আমি আমার অভিভাষণের সূচনা করিতেছি,—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।

* * * এই আমাদের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই?"

বঙ্কিমচন্দ্র আজ জীবিত নাই, কিন্তু তিনি যে লোকাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সেখান হইতে দেখিতে পাইবেন—ইতিহাস আলোচনায় বা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে বাঙ্গালীর আজ কি আনন্দ! বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তথ্য, বাঙ্গালার ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালার ছোট বড় বহু কৃতী লেখক আজ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, নিজেকে ও নিজের জাতির স্বরূপ জানিতে হইলে, ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে; আপনার দেশকে, জন্মভূমিকে চিনিতে হইলে, তাহার ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্য গতি, অন্য পন্থা নাই।

বাঙ্গালীজাতির অতীত ইতিহাস, গৌরবের অপূর্ব্ব মহিমায় সমুজ্জ্বল, তাহার দীপ্তি হিরণ্ময়রাগে রঞ্জিত। তাই বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার অতীত "ঐতিহাসিক স্মৃতির" উদ্বোধন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—"যে জাতির পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে

পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করে। * * * * জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি; ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটি মূল। ইতিহাস বিহীন জাতির দুঃখ অসীম।" আর এই জন্যই তিনি আবার জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।" মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া মনুষ্যনামের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে, অতীত গৌরবের লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধন করিতে হইলে, আমরা কি ছিলাম ও কি হইয়াছি তাহা জানিতে হইলে, আমাদের ইতিহাস চাই, ইতিহাসের চর্চ্চায়, প্রত্নতত্ত্বের উদ্ধারে, দেশের অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক তথ্যের অনুসন্ধানে আমাদের প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের সে দিন আসিয়াছে। বাঙ্গালার বহু জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত ও প্রকাশিত হইতেছে, বাঙ্গালায় বহু প্রাচীন পুথি, শিলালিপি, তাম্রফলক, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর ও মেদিনীপুরের শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চ্চা ও পুরাতত্ত্বাবিষ্কার কার্য্যের পথ অনেকটা প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গবাসী যেন নব সঞ্জীবন মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ ভারতবর্ষের কথা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। তাই আমরা প্রথমেই ভারতের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইব; তবে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমি বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস লিখিবার আদর্শ, কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ইতিহাস রচনার আদর্শের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপের জেনেভা নগরে স্যর ফ্রেডরিক পলকের সভাপতিত্বে নীতিশিক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সভায় ইতিহাসের উপদেশ ও আন্তর্জাতিক সদ্ভাব সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার অভিমতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে,—"বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে ভাবে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে,

তাহাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অসাধারণ ঘটনাবলীর প্রতি মানবের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায়, যে সমস্ত ঘটনা সমাজকে নানাপ্রকারে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত করে—সেগুলিই ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে বর্ণিত, এবং বিপর্য্যয়-কারিগণ সমধিক প্রশংসিত হইয়াছে। শান্তি ও সহযোগের মধ্য দিয়া মানবসমাজ যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার বিবরণ তেমন ভাবে বর্ণিত হয় নাই। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহযোগে পৃথিবীর বহু বৃহৎ কার্য্য, শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া সুসাধিত হইয়াছে; ঐতিহাসিকগণের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই কিংবা তাঁহারা এগুলিকে মোটেই আমল দেন নাই। ফলে এই ঘটিয়াছে যে, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনার উপরেই অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস রচনা অনেক সময়ে রাজনীতিজ্ঞ, বা মহাজন-গণের স্বার্থ সাধনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জাতীয় পক্ষপাত দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লেখনী চালনা করায় প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, নিজ দেশের অধিনায়ক কর্ত্তৃক যুদ্ধাদি ব্যাপার সাধিত হইলে, উহা সভ্যতা বিস্তারের উপায়রূপে কীর্ত্তিত হয়; আর অপর দেশের কোন অধিবাসী ঐ একই কার্য্য করিলে, সে কার্য্য বর্ব্বরতামূলক বলিয়া আখ্যাত হয়। সমশ্রেণীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা এবং সেগুলিকে ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন রকমে চিত্রিত করা মানব সমাজের পক্ষে যে অত্যন্ত অনিষ্টজনক ও নীচতামূলক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; এই সমস্ত অহিতকর ও পক্ষপাতমূলক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে পৃথিবীর মধ্যে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগ সংস্থাপিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সমস্ত সামাজিক শক্তি কার্য্যকরী হইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত সমাজের বহু কল্যাণ সাধন ও গুরুতর ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতেছে, সেগুলির প্রতি যথোচিত মনোযোগ দিতে হইবে এবং বাল্যকাল হইতে যাহাতে ছাত্রগণ এই প্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত হয় ও তাহাদের পাঠ্যপুস্তক এই শিক্ষার অনুযায়ী হয়, তাহারও বিধান করা উচিত।"

ইদানীন্তন সময়ে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিত হয়, তাহা মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে ইতিহাস লিখনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহের পথ অনেক সুগম হইয়াছে এবং যে

সমস্ত কালের ইতিহাস রচনা, একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হইত, তাহা সম্ভবপর হইয়েছে। ইহা ব্যতীত কঠোর ভাবে প্রমাণপঞ্জী পরীক্ষার নানা উপায় আমাদের আয়ত্ত হইয়াছে। আমরা এখন একস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রমাণাবলী, অপর এক বা বহু স্থানে প্রাপ্ত প্রমাণের সহিত মিলাইয়া, সেগুলির দোষগুণ বিচার ও সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারি। সাহিত্য বা দলিলাদি হইতে প্রাপ্ত প্রমাণ, ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত মুদ্রা, লিপিফলক বা অন্য কোন নবাবিষ্কৃত প্রমাণের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। এক জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণ সত্য ও সঠিক কিনা তাহা অপর কোন জাতির স্বাধীন প্রমাণের সহিত তুলনা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইতে পারি।" বাষ্প ও তড়িতের বহুল পরিমাণে উন্নতি হওয়ায়, দেশ বিদেশ ভ্রমণের বহু সুবিধা হইয়াছে, এবং এই সুবিধার ফলে দূরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থিত জাতিসমূহ সম্বন্ধে আমাদের যে সমস্ত অমূলক ধারণা বদ্ধমূল ছিল, সেগুলি অপসারিত হইবার সুবিধা হইয়াছে। মানবতত্ত্ব ও লোকাচারতত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ঐতিহাসিক তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে আলোক সম্পাৎ লক্ষ্য করিয়াছেন। বহু লিপিফলকের আবিষ্কার ও সেগুলির পাঠোদ্ধারের ফলে, মানবের অনেক ভিত্তিহীন সংস্কার একেবারে অপনোদিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইয়া ইতিহাস রচনার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহে যে কি অভাবনীয় সুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। নেপোলীয়ানের মিশর অভিযানের সময় যে প্রসিদ্ধ রোসেটা প্রস্তরফলক পাওয়া যায়, তাহারই সাহায্যে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হয়। বহুবর্ষের বহু পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে Thomas Young ও J. F. Champollion এই প্রস্তরফলকের পাঠোদ্ধারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের প্রত্নতত্ত্বালোচনার ইহা একটি বিরাট কীর্ত্তি। ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহের সাহায্যকারী নূতন উপায়গুলির সহায়তায় মিশরের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, এই সময় হইতে যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এসিয়ামাইনরে বিভিন্ন জাতীয় যে সমস্ত প্রাচীন

উনবিংশ শতাব্দী হইতে ইতিহাস রচনায় বর্ত্তমান প্রণালীর প্রচলন।

প্রত্নবিদ্যার ফলে ইতিহাসে যুগান্তর।

সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের নূতন উপায়গুলির সহায়তায় তাহাদের চিত্র আজ অঙ্কিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা সম্ভবপর হইয়াছে। [History of Egypt by Maspero & others, Vol. XII (by S. Rappoport chs. vi. vii)]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব প্রভৃতি ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। দিল্লীর অশোকস্তম্ভ ও অশোকঅনুশাসন সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা ছিল, তাহা J. A. S. B. (III. pp. 105, 106) এবং Asiatic Researches (V. 136) পাঠে জানিতে পারা যায়। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পাণ্ডবগণ যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন অপর কাহারও সহিত তাঁহাদের পরিচিত হওয়া একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাঁহাদের হিতকামী বন্ধু বিদুর ও ব্যাস, তাঁহাদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ জ্ঞাপন করা আবশ্যক মনে করিতেন। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাঁহারা পর্ব্বতগাত্রে এবং অরণ্য মধ্যস্থ প্রস্তরের উপর অন্যের অবোধ্য সাঙ্কেতিক অক্ষরে তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া রাখিতেন। দিল্লীর স্তম্ভটিকে জনসাধারণ মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের সিদ্ধি ঘুঁটিবার দণ্ড বলিয়া মনে করিত। মেজর উইলফোর্ড সাহেবকে একবার একজন পণ্ডিত, একখানি পুঁথি দিয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিয়াছিলেন। তিনি উইলফোর্ড সাহেবকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন— এই পুঁথির সাহায্যে লিপিফলক পাঠ করা সহজ হইবে। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া, তিনি ঐ পুঁথির সাহায্যে এলোরা ও সাল্‌সেটে প্রাপ্ত লিপিফলকের একাংশের পাঠোদ্ধার করিয়া যাহা Asiatic Researches পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহাও পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উইলফোর্ড সাহেবও ভ্রমে পতিত হইয়া পূর্ব্ব প্রচলিত সাধারণ ভ্রান্ত ধারণারই পোষকতা করিয়াছিলেন। সাধারণ প্রচলিত এই প্রকার ভ্রমান্ধকার ভেদ করিয়া, লিপিসমূহের প্রকৃত পাঠোদ্ধারে যে কয়জন মনীষী কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে James Prinsep-এর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন মুদ্রা হইতে প্রাপ্ত প্রমাণ ইতিহাস-রচনা কার্য্যে ও ঘটনার সত্যাসত্য

নির্ণয়ে বহুল পরিমাণে সাহায্য করে। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাঠকালে আমরা সকল সময়ে ইহা উপলব্ধি করিতে পারি না ; কারণ অনেক সময় ঐতিহাসিক ঘটনার পোষকতা ও সমর্থন কল্পে অন্য নানা-প্রমাণের সহিত মুদ্রার প্রমাণ একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় আমরা তাঁহার গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হই না। যথাযথভাবে মুদ্রার গুরুত্ব বুঝিতে হইলে, প্রাথমিক উপকরণ হইতে কিভাবে ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার দিকে একবার লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিব। এমন অনেক অজ্ঞাত রাজার নাম ও তাঁহার রাজত্বকালের তারিখ, মুদ্রার সাহায্যে পাওয়া যায়, যাহা অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যে বাহির করা সুকঠিন। সুপ্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ E. Thomas সাহেবের একখানি পুস্তক (Memoir) পাঠে জানা যায় যে ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন গাজী সাহ্ নামক একজন বাঙ্গালার সুলতানের নাম তিনি মুদ্রার সাহায্যে প্রাপ্ত হন। ঐ মুদ্রার সাহায্যে তিনি আরও জানিতে পারেন যে, ১৩৫০ হইতে ১৩৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বকাল ; কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই সুলতানের নাম মুদ্রা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে উল্লিখিত হয় নাই এবং হার্ণলে সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সুলতানের নামাঙ্কিত এই মুদ্রা পাওয়া না গেলে, তিনি অজ্ঞাত থাকিয়া যাইতেন। টমাস সাহেব ১৮৬৭ এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে দুইখানি গ্রন্থ (Memoirs) প্রকাশ করেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে কুচবিহারে প্রাপ্ত ১৩৫০০ রৌপ্য মুদ্রার সাহায্যেই তিনি বাঙ্গালার মুসলমান আমলের প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেন। সুরাষ্ট্রের ক্ষত্রপগণের নাম কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই। ১৮২৪ খৃঃ তাহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া না গেলে, কতকাল যে তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত থাকিত তাহা বলা যায় না। (Centenary Review-Pt. II pp,100, 131)

মুদ্রাতত্ত্বের গুরুত্ব।

ঐতিহাসিক প্রমাণ ও উপকরণ সংগ্রহ কার্য্যে, প্রাচীন পুথি বড় কম সাহায্য করে না। বহু অজ্ঞাত ঘটনা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাস প্রাচীন পুথির আবিষ্কার ও তাহার পাঠোদ্ধারের ফলে জানা সম্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে এ পর্য্যন্ত বহু পুথি আবিষ্কৃত ও সেগুলি সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণ পুথি-সম্পাদনের জন্য যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা অতীব শ্রমসাপেক্ষ।

প্রাচীন পুথির সম্পাদন প্রমাণ সংগ্রহের একটি প্রধান উপায়।

এই প্রণালী উত্তরোত্তর কঠোর হইতেছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌মান্ (Lefmann) সম্পাদিত ললিতবিস্তর গ্রন্থের যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে ৪৪৪ পৃষ্ঠায় মূল এবং অতিরিক্ত ২২৬ পৃষ্ঠায় পাঠান্তর সমাপ্ত হইয়াছে। ই-সেনারের (E. Senart) 'মহাবস্তু অবদান' ও পালি টেক্‌সট্ সোসাইটির দুই একখানি গ্রন্থ দেখিলেই বুঝা যায় যে, য়ুরোপে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রাচীন পুথি-সম্পাদন কিরূপ ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য কার্য্য। অধুনা এই প্রণালী অবলম্বনে পুনা নগরে ভাণ্ডারকর ওরিয়াণ্টাল রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট্ মহাভারতের যে একটি সংস্করণ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার কথা আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। কিভাবে ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করা হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য ঐ সভা একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশে যত ভাষায় মহাভারত সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ ও আলোচনা বাহির হইয়াছে, মহাভারতের যতগুলি সংস্করণ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারে বা অন্যান্য স্থানে মহাভারতের যত পুথি পাওয়া যায়, বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্পাদনে এই সমস্ত উপকরণেরই সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত সমগ্র মহাভারত বা ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের পুথিগুলি সংখ্যা প্রায় ১৩০০। সম্পূর্ণ মহাভারতখানি কোয়ার্টো আকারের প্রায় দশ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে। তন্মধ্যে প্রাকৃত সূচী প্রায় ৩০০০ হাজার পৃষ্ঠা এবং যবদ্বীপের পুথির সহিত ইহার সম্পর্ক ও অন্য বহু বিষয়ের আলোচনা সম্পর্কিত ভূমিকা প্রায় ১০০০ হাজার পৃষ্ঠা অধিকার করিবে। এই সম্পাদন কার্য্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্য্যের জন্য প্রায় ২৭০০০০ দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে। এইভাবে পুথি সম্পাদন এবং তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে যদি ইতিহাস লিখিত হয়, তবে আমরা অনেক অন্তর্নিহিত সত্য ঠিকভাবে পাইতে পারি। কিন্তু ইহার জন্য বিশেষ জ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিজ্ঞানের উন্নতির প্রভাব ও ফল ইতিহাস-ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত ও অনুভূত হইয়াছে এবং ইহা ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ ও ইতিহাস লিখিবার ধারাকে পরিবর্ত্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। ডারউইনের ক্রমোন্নতিবাদ সমাজ-সম্পর্কিত যাবতীয় বিজ্ঞানেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের

তথ্যানুসন্ধান কার্য্য, যে কঠোর নিয়মে পরিচালিত হয় এবং অনুসন্ধানের ফলে প্রাপ্ত সেই সমস্ত সংগৃহীত প্রমাণ যেরূপ কঠিন নিয়মে পরীক্ষা করিয়া সেগুলিকে ব্যবহার করা হয়, আমাদের সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও প্রমাণ যতদূর সম্ভব সেইরূপ কঠোর নিয়মেই পরিচালিত হইতেছে। এবং এইগুলি আবার তুলনামূলক প্রণালীর সাহায্যে পরীক্ষিত হয়। যে প্রণালীতে ইহাদের মধ্যে পারম্পর্য্য বা ক্রমোন্নতি সংঘটিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান কার্য্যে সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে আমরা যত্নবান হই। প্রাচীনকালে য়ুরোপে দুই একজন লেখক যে পারম্পর্য্য দর্শাইয়া ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা নহে; তবে বর্ত্তমান সময়ে বিস্তৃতভাবে এই প্রণালীর ব্যবহার দেখা যায়।

প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে বা পাশ্চাত্য দেশে আধুনিক প্রণালী অনুসারে ইতিহাস লেখা যে অসম্ভব ছিল, তাহা বুঝাইবার আবশ্যক করে না। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া হেরোডোটাস্, থিউসিডিডিস্, ডিওডোরাস্ প্রভৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এবং রোমে লিভি ও ট্যাসিটাস্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস রচনায় যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, ঐ সময়ে আমাদের দেশে সেরূপ প্রতিভার পরিচয় পাই না। অনেক সময়ে মনে হয় যে প্রাচীন ভারতীয়গণ ধর্ম্ম, দর্শন, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতিতে যেরূপ মনোযোগ দিতেন, ব্যবহারিক বিদ্যা বা কর্ম্মে তাঁহারা তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করেন নাই; এবং ইহজগৎ যাঁহাদের অনেকেরই কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত, জাগতিক যাবতীয় বস্তু যাঁহারা নশ্বর ও হেয় বলিয়া মনে করিতেন, আধ্যাত্মিক চরম উন্নতিলাভই একমাত্র কাম্য ও অভীষ্ট হওয়া উচিত বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদের কাছ হইতে ইতিহাস আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিষ্ণু পুরাণে (৪।২৪।৫৮—৭৫) ঐহিক ধনসম্পত্তির ক্ষণিকত্ব ও অসারত্ব বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে, পার্থিব ধনসম্পত্তিকে অধিকাংশ হিন্দু কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। "মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত, রঘু, যযাতি ও নহুষ প্রভৃতি রাজগণ মহাবল ও বীর্য্যশালী এবং অনন্ত ধনাধিকারী ছিলেন। তাঁহারা বলবান হইয়াও কালের প্রভাবে ইদানীং কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। * * * *

২

* * রামচন্দ্র, দশানন, অবিক্ষিত প্রভৃতির ঐশ্বর্য্যও অন্তকের কটাক্ষে ক্ষণিকের মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়াছে। অতএব ঐশ্বর্য্যকে ধিক্!" The interpretation of History নামক গ্রন্থের রচয়িতা Max Nordau তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন*। তিনি বলেন,—"মানবজাতিকে অনন্তের দিক হইতে দেখা আমাদের বন্ধ করিতে হইবে, কারণ তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টিতে উহা পরমাণুবৎ হইয়া প্রায় দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়ে। উহার স্থায়িত্ব, অর্থ বা উদ্দেশ্য থাকে না, এবং ইহা ভাবিলে আমাদিগকে একেবারে আত্মমর্য্যাদাহীন ও নিরুৎসাহ হইতে হয়। অনন্তের তুলনায় দেখিতে গেলে আমরা আমাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই না।" অতএব ইহজীবনের ইতিহাসের যে একটা গুরুত্ব আছে, তাহা বুঝিতে হইলে, অনন্তের দিকে তাকাইলে চলিবে না; আমাদের দৃষ্টিকে ইহজগতের দিকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। লৌকিকতা বা মানবতার হিসাবে যদি ইহজীবনের বা ইহজগতের কোন গুরুত্ব বা প্রয়োজন থাকে, যদি ইহজীবন আমাদের পারলৌকিক মঙ্গলের সোপান হয়, তাহা হইলে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সহিত দৃঢ়নিবদ্ধ জাতীয় জীবনের উন্নতি একটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং ইহাকে ভালরূপে গঠিত করিতে হইলে, অতীত আলোকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

পার্থিব বিষয়ে ঔদাসীন্য যে প্রাচীন ভারতের সকল যুগেই বর্ত্তমান ছিল না, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই, প্রাচীনকালে ভারতে লৌকিক বিদ্যা ও কলাসমূহের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রাচীনকাল হইতে বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দুইটি বিষয় বিদ্যার অন্যতম শাখারূপে পরিগণিত ছিল। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, সে সময়ে সকলেই সংসারবিরাগী ছিলেন এবং সাংসারিক যাবতীয় বিষয়ই জীবনকে

* We must cease to regard humanity from the point of view of eternity. It dwindles else before our eyes to an almost invisible speck, without permanence, significance, or aim, the contemplation of which leaves us utterly humiliated, broken and dispirited (৩৬৯, ৩৭০ পৃঃ)।

ভারাক্রান্ত করে এরূপ ধারণার পোষকতা করিতেন, তাহা হইলে গণিতাদি বিদ্যা ও শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতি বিধায়ক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত হইতেই পারিত না। এবং তৎকালে সেগুলির সমধিক উৎকর্ষও সাধিত হওয়া সম্ভব হইত না। দ্বিতীয়তঃ সে সময়ে সংসার বিরাগী একদল লোক বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহজগৎই আমাদের ভবিষ্যৎ সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের আকর এবং চতুর্ব্বর্গের মধ্যে অর্থ অন্য তিনটির ভিত্তি এই মত প্রাচীন কালেও যে সুপ্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ সংসারের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক নিয়ম, এই স্বাভাবিক নিয়মকে প্রতিরোধ করিয়া সমস্ত বা অধিকাংশ লোকই যে ব্যাবহারিক বিষয়ে উদাসীন থাকিবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব। প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের উপযোগিতা বুঝিতেন না, এই অপবাদ প্রচলিত থাকিলেও ক্রমেই আমরা ইহার অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থানে ইতিহাস একটি শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। (১)

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বোধ।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও মনুসংহিতায় বহুবচনান্ত 'ইতিহাস' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, তৎকালে অনেকগুলি ইতিহাস প্রচলিত ছিল। বোধ হয়, গ্রন্থ সংখ্যা লক্ষ্য করিয়াই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের বহুস্থানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে ইতিহাসের উল্লেখ।

কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে রাজার জন্য ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছেন (১, ৫) এবং রাজাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য মন্ত্রীকেও ইতিহাসাভিজ্ঞ হইতে বলিয়াছেন (৫, ৬) ইহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ভারতীয়গণ ইতিহাসের রাজনৈতিক মূল্যও বুঝিতেন।

প্রাচীন ভারতে ইতিহাসের রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা বোধ।

---

(১) অথর্ব্ব সংহিতা ১১, ৬৪ ; শতপথ ব্রাহ্মণ ১, ৩, ৪ ; ৩, ১২, ১৬ ; জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১, ৩৫ ; গোপথ ব্রাহ্মণ ১, ১০ ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২, ৯ ; ছান্দোগ্য ৭, ১, ২, ৪ ; শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৬, ২০, ২১, ২৭ ; আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪, ৬, ৬ ; মনুসংহিতা ৩, ২৩২ ; নিরুক্ত ২, ১০ ; ২৪ ; ৪, ৬ প্রভৃতি ; মহাভাষ্যের ভূমিকা ; কাদম্বরী (পূর্ব্বভাগ, চন্দ্রাপীড়ের বিদ্যা শিক্ষা বর্ণনা)।

যাস্কের নিরুক্ত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং পুরাণের বহু প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে কেবল ইতিহাসচর্চ্চার জন্য একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ঐ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক শিষ্যপরম্পরায় আলোচিত হওয়ায় ইতিহাস-বিদ্যা বিশেষভাবেই পরিপুষ্টি লাভ করে, যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে (২, ১৬, ২; ১২, ১, ৮; ১২, ১০, ১) এই ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মত বারংবার প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। Anc. Ind. Historical Tradition নামক গ্রন্থে (২৬ পৃঃ) পাজিটার সাহেব বলেন—পুরাণের বহুস্থলে উল্লিখিত 'পুরাবিদ্', 'পুরাণবিদ্', 'পুরাণজ্ঞ', 'পৌরাণিক জন' প্রভৃতি শব্দও ঐরূপ বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তারপর, পুরাণেই সূত ও মাগধ নামক দুইটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। "দেবতা, ঋষি, রাজা ও বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের বংশাবলী রক্ষা করা সূতের স্বধর্ম্ম ছিল (বায়ু পুরাণ ১, ৩১-৩২; পদ্ম ৫, ১, ২৭-২৮)। গর্গ-সংহিতার গোলোক খণ্ডে (১২, ৩৬) এবং রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের (৬, ৬) টীকায় এই সূতগণ পৌরাণিক নামে এবং মাগধগণ বংশাবলী রক্ষক নামে উল্লিখিত দেখা যায়।

ইতিহাসালোচনার জন্য পৃথক সম্প্রদায়।

অর্থশাস্ত্রে (৩, ৭) কৌটিল্য বলিয়াছেন যে,—পৌরাণিক সূত ও মাগধগণ প্রতিলোমজ সূত ও মাগধ জাতি হইতে ভিন্ন। পাজিটার সাহেব (১৭ পৃঃ) মহাভারত হইতে শ্লোক তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরবর্ত্তী কালে এই প্রতিলোমজ জাতি প্রাচীন পৌরাণিক সূতগণের জীবিকা অবলম্বন করায় সূত নাম লাভ করিয়াছিল (১)।

পুরাণে এই প্রাচীন সূতগণের উদ্দেশে 'বংশাধিত্তম,' 'বংশ কুশল' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া বুঝা যায় যে, ইঁহারা বিশেষভাবে বংশাবলীর পর্য্যালোচনা করিয়া ইতিহাসের এক শ্রেণীর উপকরণ রক্ষা করিতেন।

কেবল বংশতালিকা যে ইতিহাস নহে তাহা এদেশের ঐতিহাসিকগণ বহুকাল পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। ইঁহারা জানিতেন "ইতিহাসে ধর্ম্ম, অর্থ,

(১) যশ্চ ক্ষত্রাৎ সম্ভবদ্ ব্রাহ্মণ্যাং হীনযোনিতঃ।
সূতঃ পূর্ব্বেণ সাধর্ম্ম্যাৎ তুল্যধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

কাম, মোক্ষের উপদেশ থাকে," অতীত ঘটনা পরম্পরা দ্বারা সমাজের ভাল-মন্দ শিক্ষা হয়। সম্ভবতঃ ইতিহাসকে ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ করার দিকে একটু অধিক দৃষ্টি পড়ায় বহু স্থলে পুরাণগুলির ঐতিহাসিক বিশুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল। ইতিহাসের ঐরূপ উপদেশাত্মক উদ্দেশ্য মনে রাখিয়াই বোধ হয়, মহাভারতকে প্রকৃষ্টতম ইতিহাস বলা হইয়াছে (মহাভারত, আদি ১, ২৬৬) এবং কল্পনাকেও ইতিহাসের পাশে স্থান দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে; কারণ আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১, ৫) দেখিতে পাই যে, তখন ইতিহাস বলিতে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র এই সমস্তই বুঝাইত। ইতিহাসের এই ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি—কেন কোন কোন স্থলে (পদ্ম ২, ৮৫, ১৫; বায়ু ৫৫, ২) নিতান্ত কল্পিত ঘটনাকেও ইতিহাস নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ছয়টি নামই ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে পড়িলেও ভারতীয়গণ ইহাদের মধ্যে সত্য ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের বিশেষত্ব কিরূপ তাহা জানিতেন।

ইতিহাসের ব্যাপক-সংজ্ঞা।

পুরাণে যে পাঁচটি বিষয়ের আলোচনা আছে সেগুলি ইহার পাঁচটি লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত। সেগুলি হইতেছে—সর্গ, বিসর্গ, বংশ, বংশানুচরিত ও মন্বন্তর। এইগুলির মধ্যে বংশ ও বংশানুচরিতে রাজগণের নাম, রাজত্ব, সময় ও বিশিষ্ট রাজগণের সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ হইত। ইতিহাসের অন্তর্গত 'উদাহরণ' কিরূপ ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (১৩) ও বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (১,২) উদ্ধৃত আছে বলিয়া মনে হয়। রাজার ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করা উচিত। এই কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ যে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়াও ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হওয়ায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা 'উদাহরণ' প্রয়োগে দেখান হইয়াছে। 'উদাহরণে'র উদ্ধৃতাংশ এইরূপ :— "দাণ্ডক্য ভোজ কামের বশবর্ত্তী হইয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাজ্য ও বন্ধুগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিলেন। বৈদেহ করালেরও পরিণাম ঐরূপ হইয়াছিল। জনমেজয় ব্রাহ্মণগণের প্রতি ও তালজঙ্ঘ ভৃগুগণের প্রতি ক্রোধের বশবর্ত্তী হওয়ায় ও সৌবীর অজবিন্দু চতুর্ব্বর্ণের নিকট হইতে লোভে পড়িয়া অতিরিক্ত অর্থ শোষণ করায়, রাবণ অহঙ্কারের আধিক্যে

পরদার প্রত্যর্পণ করিতে ও দুর্য্যোধন রাজ্যের অংশ ছাড়িতে অস্বীকৃত হওয়ায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মদান্ধ হইয়া দম্ভোদ্ভব ও হৈহয় অর্জ্জুন লোকের অবমাননা করায়, ও অতিরিক্ত হর্ষে বাতাপি অগস্ত্যকে, ও বৃষ্ণিসঙ্ঘ দ্বৈপায়নকে আক্রমণ করায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" ইহার পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা ব্যতীত অনেক রাজা ছিলেন যাঁহাদের নাম ঐ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে ; পক্ষান্তরে জামদগ্ন্য, অম্বরীষ, নাভাগ প্রভৃতি নরপতি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমগ্র পৃথিবী সুখে ভোগ করিয়া ছিলেন। এই উদাহরণ সত্য ঘটনামূলক ;—কল্পনাপ্রসূত নহে বলিয়াই মনে হয়। তারপর যে ইতিহাসের অন্তর্গত ইতিবৃত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে উহাতে আরও বিশদভাবে অতীত ঘটনার যথাযথ বর্ণনা থাকিত বলিয়াই অনুমান হয় (মহাভারত ১, ১, ১৬)।

একই শ্লোকে 'ধর্ম্মার্থসংশ্রিত পবিত্র পুরাণ সংহিতার' পাশেই 'নরেন্দ্র ও ঋষিদিগের ইতিবৃত্তের' উল্লেখ দেখিয়াও এইরূপই মনে হয়। বায়ু (১০৩।৪৮।৫১, ৫৫-৫৮) ও ব্রহ্মাণ্ড (৪।৪, ৪৭, ৫০) উভয় পুরাণেই দেখা যায় যে উহারা একাধারে পুরাণ ও ইতিহাস ; অর্থাৎ উহাতে পুরাণোচিত উপদেশও আছে, ইতিহাসোচিত যথার্থ বৃত্তান্তও আছে। এখানে ইতিহাস শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রাচীন ভারতীয়গণ ইতিহাসের আবশ্যকতা বুঝিতেন, তবে কোন ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আমাদের হস্তগত হয় নাই কেন? মহম্মদীয় শাসনকালে বিহারও ওদন্তপুরীর বিপুল গ্রন্থাগার ধ্বংসের মত ঘটনা হইতেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এইরূপ ঘটনা ভারতের ভাগ্যে বিরল নহে, সুতরাং বহু ইতিহাসের সত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাইলেও অদ্যাপি তাহা আমাদের হস্তগত না হওয়ার কারণ ঐতিহাসিকগণ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন।

আধুনা-লুপ্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অস্তিত্বের প্রমাণ।

ভবিষ্যপুরাণের কথা ছাড়িয়া দিলে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে গুপ্ত বংশের রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাজগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়।

ইহার পরে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে য়ুয়ান্ চুয়াং (Watters, Vol I, p. 154) লিখিয়াছেন, "তৎকালে ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল; এই সকল ঘটনালিপির নাম ছিল 'নীলপিট'। ইহাতে জাতির ভাল, মন্দ, বিপদ, সম্পদ সকল বৃত্তান্তেরই উল্লেখ থাকিত।"

য়ুয়ান্ চুয়াং বর্ণিত 'নীলপিট'।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কল্হণ বলিয়াছেন—'নীলমত পুরাণ' ব্যতীত আরও এগার জন পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে উপকরণ লইয়া তিনি রাজতরঙ্গিণী রচনা করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগের মধ্যে 'নৃপাবলী'কার ক্ষেমেন্দ্র, 'পার্থিবাবলীর কর্ত্তা হেলারাজ, এবং পদ্মমিহির, ছবিল্লাকর, ক্ষোনরাজ, শ্রীবর ও প্রাজ্যভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কল্হণ তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে (১।৯) ভূমিকাস্বরূপ যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বে বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ও তাঁহার সময়ে সেগুলি বহু পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। এবং মনেরাখিবার সুবিধার জন্য সুব্রত কর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ রচিত হওয়ায় প্রাচীন বৃহৎ গ্রন্থগুলির রক্ষার প্রতি লোকের দৃষ্টি ছিল না। কল্হণের এই সকল উক্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে ইতিহাস এরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল যে, ঐজন্য সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ গ্রন্থও রচনা করিতে হইয়াছিল।

কল্হণোক্ত ইতিহাস গ্রন্থ ও ঐতিহাসিকগণ।

ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার।

রাজস্থানের ভূমিকায় (৮।৯ পৃঃ) টড্‌সাহেব বলিয়াছেন—চাঁদ কবির পৃথ্বীরাজ রাসো দেখিলে মনে হয় যে, তাঁহার সময়ে ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের বহু ইতিহাস গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির একখানিও পাওয়া যায় না।

ইতিহাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে টড্ সাহেবের উক্তি।

নৈষধীয় চরিতে শ্রীহর্ষ (১২৮০ খৃঃ অঃ) তাঁহার রচিত 'নবসাহসাঙ্ক-চরিত' ও 'গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি' নামক দুইখানি ঐতিহাসিক কাব্যের নাম করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত ইহার একখানিরও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

শ্রীহর্ষের নব সাহসাঙ্কচরিত ও গৌড়োর্বীশ-কুলপ্রশস্তি।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে প্রবন্ধচিন্তামণিকার মেরুতুঙ্গ (১,৩) বলিয়াছেন যে বহু সংগ্রহ গ্রন্থের আখ্যানভাগ লইয়া তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল সংগ্রহ-গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

প্রবন্ধচিন্তামণিতে গৃহীত আখ্যান ভাগের বহু আদর্শ গ্রন্থ

ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ও বিক্ষোভের কথা ভাবিয়া দেখিলেই দেশে জাতীয় ইতিহাসের দুর্লভতার কারণ বুঝা যায় এবং ভারতীয়গণের ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া যায়।

নানা বিপদের মধ্য দিয়া আসিয়া যেসকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমাদের হাত পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিয়াছে, তাহার প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহাই আমরা এখন আলোচনা করিব। প্রথমেই পুরাণের কথা ধরিতে হয়—

ধ্বংসাবশিষ্ট গ্রন্থ-গুলির ঐতিহাসিক মূল্য।

পুরাণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার পর পার্জ্জিটার সাহেব (Ancient Ind. Hist. Trad. ২৪ পৃঃ*) পদ্মপুরাণ হইতে (৬, ২৯,৩৭) পুরাণের উৎপত্তিবিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঋষিরা প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে আবশ্যক বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। সকল পুরাণেই বারংবার উল্লিখিত 'অনুশুশ্রুমঃ' 'ইতি নঃ শ্রুতম্,' ইতি শ্রুতিঃ' প্রভৃতি প্রয়োগগুলি দেখিলেও বুঝা যায় যে ঐতিহাসিকগণের নিকট শ্রুত ঘটনাই পুরাণের অবলম্বন। পুরাতন ঘটনা আছে বলিয়াই ইহার নাম পুরাণ। এখন আমরা যে আকারে পুরাণ পাইতেছি, তাহাকে আর ঠিক ইতিহাস বলা চলে না। বিষ্ণুপুরাণে (৩,৬,১৬) লিখিত আছে, 'পুরাণার্থ বিশারদ মুনি আখ্যান, উপখ্যান, গাথা ও কল্পজোক্তি দ্বারা পুরাণ সংহিতা রচনা করিয়াছেন'। এইরূপ পুরাণই

পুরাণের ঐতি-হাসিক মূল্য।

এখন আমরা পাইতেছি। লিঙ্গপুরাণ (১, ৩৯,৬১) হইতে জানা যায় যে, কালক্রমে ইতিহাস ও পুরাণ পৃথক্ হইয়া গিয়াছিল। এই পুরাণকে ইতিহাসের গণ্ডীতে ফেলিবার জন্যই বিষ্ণুপুরাণের (৩,৪,১০) টীকায় শ্রীধর স্বামী ইতিহাসের লক্ষণ দিয়াছেন—

'আর্ষাদিবহুব্যাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্ম্মযুক্ ॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইতিহাসকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ পূর্ণ করার দিকে বড়ই ঝোঁক পড়িয়াছিল, তাহার সহিত এই "ভবিষ্য ও অদ্ভুত ধর্ম্ম" মিশিয়া পূর্ব্বের ইতিহাসপুরাণকে অন্য আকারে পরিণত করে।

পুরাণের প্রথম অবস্থা হইতে আধুনিক অবস্থার পার্থক্য।

বোধ হয়, প্রথমে পুরাণে 'বংশ' ও 'বংশানুচরিত' মাত্র ছিল, পরে 'সর্গ, (প্রধান সৃষ্টি), 'প্রতিসর্গ' (অবান্তর সৃষ্টি) এবং 'মন্বন্তরের' কথাও পুরাণের বিষয় হইয়া উঠিল, এবং ক্রমে এই 'পঞ্চলক্ষণ' পুরাণ আবার ভাগবতোক্ত 'দশ লক্ষণের'ও বিষয়ীভূত হইল। কিন্তু এই পুরাণ দ্বারাও আমরা বহুস্থলে প্রাচীনকালের যথার্থ ইতিহাস জানিতে পারি। পার্জিটার সাহেব (২৪ পৃঃ) বলেন—এই পুরাণের মধ্যেই (বায়ু ৯৫,১৫) 'ইচ্ছন্তি' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, কোন বংশবর্ণনার সময় কোন নামের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আলোচনা দ্বারা যথার্থ মতটিই গ্রহণ করা হইত। নবাবিষ্কৃত লিপিফলক দেখিয়া অনেকস্থলে পুরাণোক্ত বংশাবলী বিশুদ্ধ বলিয়া জানা গিয়াছে।

পুরাণ ব্যতীত আমরা কয়েকখানি চরিত গ্রন্থ পাইয়াছি। ইহাতে

চরিত ও প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য।

কাব্যোচিত বর্ণনার আধিক্য থাকিলেও অনেকস্থলে ইহা দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়; ইহাতে সাধারণতঃ কবিগণ তাঁহাদের আশ্রয়দাতা রাজাদের বংশ, বিক্রম, সমসাময়িক রাজা ও রাজ্যের বর্ণনা করিয়াছেন।

বুলার বলিয়াছেন—এই সকল চরিত ও প্রবন্ধে সংস্কৃত কাব্যোচিত বহু অতিশয়োক্তি আছে, ইহা সত্য; তথাপি কবিরা কেবল কল্পনাবলেই

কোন নাম উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছেন, এমন কোন দৃষ্টান্ত আমরা আজ পর্য্যন্ত এই সকল গ্রন্থে পাই নাই; বরং নূতন নূতন আবিষ্কৃত শিলালিপি-গুলি হইতে ক্রমেই আমরা উহাদের বহু নামের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব জানিতে পারিতেছি। সুতরাং এই সকল চরিত ও প্রবন্ধের দিকে ঐতি-হাসিকগণের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত (Bühler, Uber das leben des Jaina menches Hemchandra p. 6.)

বাণভট্টের হর্ষচরিত (খৃঃ ৭ম শতক), বাক্‌পতিরাজের (অষ্টম শতকের প্রথমভাগ) গউড়বহো, পদ্মগুপ্তের (১১ শতকের শেষ ভাগ) নবসাহসাঙ্ক চরিত, বিল্‌হনের (১১শ শতক) বিক্রমাঙ্ক চরিত, হেমচন্দ্রের দ্ব্যাশ্রয় কাব্য (কুমারপাল চরিত), সন্ধ্যাকর নন্দীর (১১শ শতক) রামপাল চরিত (দ্ব্যাশ্রয়), বুলারের চালুক্য-রাজ-বংশ-সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় উল্লিখিত হর্ষগণির বস্তুপাল-চরিত, সোমেশ্বরের কীর্ত্তিকৌমুদী, রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ, এবং মেরুতুঙ্গের (১৪শ শতক) প্রবন্ধচিন্তামণি,—এই কয়খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া পৃথ্বীরাজ-চরিত নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

এইগুলির মধ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই উহাদিগের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

থানেশ্বরের সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের জীবনীই হর্ষচরিতের বিষয়। বুলার বিক্রমাঙ্ক-চরিতের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে,—"য়ুয়ান্ চুয়াং হর্ষবর্দ্ধন সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সবই প্রায় হর্ষচরিতে পাওয়া যায়; অধিকন্তু চৈনিক পরিব্রাজকের বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি টান থাকায় তাঁহার বর্ণনায় যে সকল ভ্রম-প্রমাদ আছে, হর্ষচরিত দেখিয়া অনেক স্থলেই তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে। চালুক্য বংশ সম্বন্ধে বহু শিলা-লেখ পাওয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া অনেক স্থলে বিক্রমাঙ্কচরিতের বর্ণনার সত্যতা জানা যায়।

হর্ষচরিত।

বিক্রমাঙ্কচরিত।

নবসাহসাঙ্কচরিতে মালবের রাজা পরমার বংশীয় সিন্ধুরাজের বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা আছে। বুলার বলেন—'ইহাতে কাব্যাংশই বেশী। তাহা হইলেও শিলালিপি প্রভৃতির সহিত মিলাইয়া লইলে ইহা হইতেও পরমার বংশের অনেক কথা জানা যায়'।

নবসাহসাঙ্কচরিত।

প্রাকৃত গউড়বহো কাব্যে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার গৌরব বর্ণনা আছে। গউড়বহো নাম হইলেও ইহাতে গৌড়ের রাজার কথা বড় বেশী নাই। রাজতরঙ্গিণীতে বর্ণিত কাশ্মীরের ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক যশোবর্ম্মার উচ্ছেদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঘটনার কিছু বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়।

গউড়বহো।

হেমচন্দ্র দ্ব্যাশ্রয় কাব্যে তাঁহার সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলির জন্য উদাহরণ রচনার সঙ্গে সঙ্গে অনহিল্লপুরের রাজাদের বিশেষতঃ প্রাকৃত অংশে, কুমারপালের বর্ণন করিয়াছেন।

দ্ব্যাশ্রয় কাব্য।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে লিখিত মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতেও গুজরাটের ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়।

প্রবন্ধচিন্তামণি।

কল্হণের রাজতরঙ্গিণীর কিয়দংশের ঐতিহাসিক মূল্য আরও অধিক। এখানিও কাব্য; কিন্তু কোন রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার গৌরব বর্ণনা করার জন্য এইখানি লিখিত হয় নাই। কাশ্মীরের রাজগণের এই ধারাবাহিক ইতিহাসের প্রথম অংশে পুরাণের মত কল্পনা এবং অনেক ভ্রমপ্রমাদ দেখা যায়, কিন্তু শেষ অংশে খৃষ্টীয় ৭ম শতকের রাজাদের সময় হইতে ইহা ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। কল্হণ তাহার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমকালের রাজাদের দোষগুণ প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় সমালোচনা, এবং রাজ্যের উত্থানপতনের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। কল্হণ স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা গ্রহণ করিবার সময়ে যতদূর পারিয়াছেন প্রতিষ্ঠা-শাসন, বস্তু-শাসন, প্রশস্তি পট্ট এবং শাস্ত্র দ্বারা তাহার সত্যতা নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন (রাজতরঙ্গিণী ১, ১৫)।

রাজতরঙ্গিণী।

যিনি রাগ দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া অতীত ঘটনা বর্ণনা করিতে পারেন, কল্হণ তাঁহাকেই প্রশংসা করিয়াছেন (রাজতঃ ১,৭); ইহাতেই বুঝা যায় যে, ভারতে ইতিহাস রচনার আদর্শ বেশ উচ্চই ছিল।

কল্হণ কথিত ঐতিহাসিকের আদর্শ।

পৌরাণিক সূত ও মাগধগণের বংশ ও বংশাবলী আলোচনার প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রের 'বখর', আসামের 'বুরঞ্জী' এবং উড়িষ্যার 'মাদ্‌লাপাঁজীর' মূলেও ঘটনা লিপিবদ্ধ

করার প্রথাই পরিদৃষ্ট হয়। রাজপুতানার ভাটগণ আপনাদিগকে মাগধ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। পৃথ্বীরাজ রাসো প্রণেতা চাঁদকবি ভাট ছিলেন; তাঁহার বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান আছেন। রাজপুতানার 'বরোত্র'গণের নিকট ১৫০০ বৎসরের প্রাচীন বংশাবলীরও সংবাদ পাওয় যায়। চারণ নামে আর এক জাতি আছে; ইহারা পৌরাণিক সিদ্ধচারণদের নামে আত্মপরিচয় দেয়। বংশাবলী রক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধের কীর্ত্তি রক্ষাতেই ইহাদের বেশী আগ্রহ। ইহারা যুদ্ধের বিবরণ লইয়া রাজাদের জীবন চরিত লিখিয়া থাকে। সুরয-প্রকাশ ইহাদের লিখিত একখানি পুস্তক। ইহাতে সূর্য্যবংশের অর্থাৎ রাঠোর দিগের বিবরণ আছে। বীরবিনোদ নামক আর একখানি বই ছাপা হইয়াছে, কিন্তু উদয়পুরের রাণা প্রকাশ করিতে দেন নাই। টড্ সাহেবের রাজস্থান বাহির হইলে বুঁদির প্রধান চারণগণ রাগ করিয়া 'বংশভাস্কর' নামে একখানি বই লিখে; ইহাতে প্রধানতঃ বুঁদির 'হারা চৌহান' রাজাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতানার অন্য রাজাদের বৃত্তান্ত আছে। রাজপুতানার খেত, বাত, গপ্ ও দন্তকথা এই চারিপ্রকার ইতিহাস লেখা হয়। ইহার মধ্যে খেতই প্রকৃত ইতিহাস, অন্য সবগুলিতেই অল্প-বিস্তর বাজে কথা আছে। বাঙ্গালাদেশেও ভাট সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল, এখন ইহার নাম মাত্র আছে।

ভাট, বরোত্র ও চারণগণ বংশ-পরিচয় রক্ষা করে।

এতদিন পণ্ডিতগণ পুরাণবর্ণিত কাল-গণনার কোনই মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু পুরাণের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই এই কাল-গণনার অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পার্জিটার সাহেব তাঁহার Ancient Indian Historical Tradi-toin নামক গ্রন্থের ১৭৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে সম্ভবতঃ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত যুগ পরিবর্ত্তনের ধারণা পুরাণে স্থান পাইয়াছে। রাম জামদগ্ন্য রাজরক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়া দেশে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ছিলেন তাহার পর হইতেই দ্বিতীয় যুগ ত্রেতার আরম্ভ হয়; সম্ভবতঃ রাম-রাবণের যুদ্ধের পরেই ভারতবর্ষে দ্বাপরের আবির্ভাব হইয়াছিল

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইতে যুগ-বিভাগের উৎপত্তি।

এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের সহিত কলিযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল (J. B. O. R. S. Vol. III) সংপ্রতি ভারতযুদ্ধ ও কলিযুগের প্রারম্ভকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পুরাণে বহুস্থলে সপ্তর্ষিচক্র অনুসারে কালনির্দ্দেশ দেখা যায়। সপ্তবিংশটী নক্ষত্রের প্রতিনক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অবস্থিতি কাল এক শত বৎসর সুতরাং সপ্তবিংশ শত বৎসরে একটী সপ্তর্ষিচক্র পূর্ণ হয়। জয়স্বাল মহাশয় অনুমান করেন যে কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে সপ্তর্ষিচক্রের আরম্ভ হয়। পুরাণ হইতেই জানা যায় যে, সপ্তর্ষিমণ্ডলের মঘায় অবস্থান কালে অর্থাৎ অষ্টম শতকে পরীক্ষিত সিংহাসন লাভ করেন এবং কলিযুগ আরম্ভ হয়। তৎপরে পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন কালে অর্থাৎ হাজার বৎসর পরে অষ্টাদশ শতকে নন্দরাজ রাজত্ব করেন। আরও ছয় শত বৎসর পরে সপ্তর্ষিচক্রের চতুর্ব্বিংশ শতকের অর্থাৎ উত্তরভাদ্রপদে অন্ধ্র রাজত্ব শেষ এবং সপ্তবিংশ শতকে অর্থাৎ ভরণীতে অন্ধ্রের পরবর্ত্তী রাজ্যেরও পতন হয়। পুরাণেই উল্লিখিত দেখা যায় যে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক হইতে মহাপদ্মের ব্যবধান একহাজার পঞ্চাশ বৎসর এবং মহাপদ্ম হইতে অন্ধ্রের পরবর্ত্তী রাজত্ব কালের ব্যবধান আটশত ছাত্রিশ বৎসর। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উভয় গণনা দ্বারা একরূপই ফল পাওয়া যায়।

পৌরাণিক নৃপতিগণের ঐতিহাসিকতা ও তাহাদের কালনির্ণয় সম্বন্ধে গবেষণা।

এখন অন্য প্রমাণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাপদ্ম খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন; এই সময় হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতকে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক এবং কলির আরম্ভ হয়।

জয়স্বাল মহাশয় ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে বারশত বৎসর পরে যবন (গ্রীক) রাজ্যের পতনের সহিত কলির শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে এই সময় অতি অল্প মনে হওয়ায় উহাকে মানব বৎসরের পরিবর্ত্তে দৈব

বৎসর করা হয় সুতরাং ১২০০ শত বৎসর (১২০০×৩৬০) ৪৩২০০০ বৎসরে পরিণত হইল। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, মহাপদ্ম হইতে অন্ধ্রান্ত রাজগণের শেষ রাজার ব্যবধান আট শত ছত্রিশ বৎসর (অর্থাৎ ৪৯৮ খৃষ্টাব্দ)। ইহা সপ্তর্ষিচক্রের সপ্তবিংশ শতক। জয়স্বাল মহাশয় বলেন যে, বোধ হয় পরবর্ত্তী গণিতবিদ্গণ ইহা জানিতেন এবং মহাপদ্ম যে সপ্তর্ষিচক্রের অষ্টাদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাও জানিতেন। এক্ষণে তাঁহারা ৪৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০০ শত বৎসর পশ্চাতে যাইয়া খৃঃ পূঃ ৪০২ অব্দ পাইলেন এবং উহা হইতে আরও এক সপ্তর্ষিচক্র অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর পশ্চাতে যাইয়া অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে কলির আরম্ভকাল নির্ণয় করিলেন। এই আলোচনা দ্বারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্য্যন্ত যে কাল-গণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যাইতেছে অন্ততঃ ঐ সময় পর্য্যন্ত পুরাণের বর্ণনায় অসঙ্গতি নাই।

পার্জিটার সাহেব বলেন (১৮০ পৃঃ) পুরাণের বর্ণনায় পরীক্ষিতের পর মহাপদ্মের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অল্প কয়জন রাজার নাম আছে, তাঁহারা ১০৫০ বৎসর ধরিয়া এত দীর্ঘ কাল রাজত্ব করিতে পারেন না—সুতরাং পরীক্ষিত হইতে মহাপদ্মের ব্যবধান কালের গণনায় পুরাণের উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি ঐ রাজাদের প্রত্যেকের রাজত্বকাল আনুমানিক ১৮ বৎসর ধরিয়া (২৬×১৮) ৪৬৮ বৎসর স্থির করিয়াছেন এবং তাহার আরও ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতে মহাপদ্মের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে খৃঃ পূঃ নবম শতক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়।

কিন্তু আমাদের মনে হয়, এস্থলে জয়স্বাল মহাশয়ের মতই অধিক যুক্তিযুক্ত। তিনি পুরাণপ্রাপ্ত সপ্তর্ষিচক্রের গণনা এবং ব্যবধান কালের উল্লেখের আলোচনা করিয়া দুই উপায়েই একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমরা পুরাণে যে কয়জন রাজার নাম পাই, তাঁহাদের পক্ষে তত দীর্ঘকাল রাজত্বভোগ অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পার্জিটার সাহেবই (৮৯ পৃঃ) বলিয়াছেন যে, পুরাণের কোন কোন স্থলে কেবল প্রধান প্রধান রাজগণের নামই উল্লিখিত হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র রাজাদের নাম বাদ পড়িয়াছে।

গত কয়েক বৎসরে পণ্ডিতগণের চেষ্টায় নূতন নূতন অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের সম্মুখে বহু আলোচ্য বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় রীতিমত আলোচিত হইলে কতকগুলি অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত তথ্য সম্বন্ধে নূতন আলোক পাওয়ার আশা করা যায়। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান ছিল, তাহার যথার্থতা কোন কোন স্থলে এখন আর অবিসংবাদিত নহে। কোন স্থলে পুরাতন মতের বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কোন স্থলে বা প্রচলিত ধারণায় সংশয় উপস্থিত হইতেছে। প্রাচীন যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা লইয়াই এই বিষয়গুলি জড়িত।

নূতন নূতন গ্রন্থ-প্রকাশের ফলে নূতন আলোচ্য-বিষয়ের উদ্ভব।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ কুরুপঞ্চাল দেশেই বৈদিক সভ্যতা ও প্রাচীন বিদ্যালোচনার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধারণা আছে। কিন্তু এখন এমন সব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যাহাতে মনে হয়, পূর্ব্বভারতও অতি প্রাচীনকালেই বৈদিক সভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে আলোকিত হইয়াছিল; সুতরাং এ বিষয়ে প্রমাণ সংগ্রহ আবশ্যক। আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে এবং আর্য্যগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ ও আপেক্ষিক প্রতিপত্তি সম্বন্ধে চর্চ্চা আবশ্যক এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রভাবে অনার্য্যগণ কি উপায়ে এবং কি পরিমাণে অভিভূত হইয়াছিল—তাহাও নির্ণয় করা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বেদশাখার 'চরণ'গুলি সেই সকল প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের সংরক্ষণ, পরিপুষ্টি ও বিস্তার কার্য্যে কি উপায়ে, কতটা সহায়তা করিয়াছিল, এবং আরুণি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বৈদিক যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মতবাদের প্রত্যেকটির কিরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তাঁহাদিগের মতের প্রভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমকালীন মতের ও সমাজের উপর কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল এই সকল এবং এইরূপ আরও অনেক বিষয় নির্ণয়ের জন্য পণ্ডিতগণের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

যে প্রণালী অবলম্বনে আমাদের ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইতেছে,

তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ঐতিহাসিকগণ যে ভাবে ধর্ম্মের ইতিহাস বা বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে কেবল ধর্ম্মের বহিরঙ্গের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে, উহার প্রাণ যে সাধনা, তাহার দিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখেন না। ফলে ইহা দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের সহজ বুদ্ধিতে বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলি দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া যেগুলি টিকিয়া থাকিতে পারে না, সেগুলিকেই আমরা অবিশ্বাস করি। ইহার দ্বারা ধর্ম্মের প্রাণ ও উহার বহিরঙ্গ, এই উভয়ের মধ্যে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে এবং যে প্রাণের উপর বহিরঙ্গের গুরুত্ব নির্ভর করে ও যাহার সাহায্যে ঐ বহিরঙ্গকে বুঝা যায়, সেই প্রাণকেই তুচ্ছ জ্ঞান করায় ধর্ম্মের বহিরঙ্গও আমাদের চক্ষে মূল্যহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়। সাধারণতঃ প্রাচীন ভারতে অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা যেরূপ হইয়াছিল, এখন আর সেরূপ হইতেছে না। তারপর য়ুরোপীয়গণ এই অধ্যাত্ম-বিদ্যার প্রান্তে রহিয়াছেন; কিন্তু ইতিহাস রচনায় তাঁহারা যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রচলন করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। সুতরাং অধ্যাত্ম-বিদ্যা না বুঝিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের যে সামান্য অংশ বুঝা যায়, এবং না বুঝার জন্য যে বেশী অংশটার উপর অনাস্থা জন্মে, এই উভয়ের সমবায়ে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইয়া থাকে আর তাঁহাদের প্রদত্ত এই শিক্ষা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। কোন বিশেষ বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে, ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন বৈজ্ঞানিকের বা তাঁহার রচিত গ্রন্থের সাহায্যে উহা জানিতে না পারিলে আমরা সন্তুষ্ট হই না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিতে হইলে, ইহার সূক্ষ্ম বিষয়গুলি যিনি না জানেন এবং যিনি নিজের জীবনে সেগুলি উপলব্ধি করেন নাই, এরূপ লোকের নিকট হইতে এই বিষয়গুলি জানিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই। আমাদের বেদ পুরাণাদিতে এমন অনেক বিষয় আছে যে, অধ্যাত্ম-বিদ্যায় জ্ঞান না থাকিলে সে গুলি সম্যক্‌রূপে বুঝা যায় না, আর ইহারই অভাবে য়ুরোপীয়গণ ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গের নিকট সেগুলি মাত্র কুসংস্কারের সমষ্টিস্বরূপে প্রতিভাত হয়। ধর্ম্মের এই প্রকার ইতিহাস দ্বারা আমাদের দেশের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে।

ধর্ম্মের ইতিহাস কিভাবে লিখিত হওয়া উচিত।

সুতরাং ধর্ম্মের বহিরঙ্গ, ও সাধকগণের নিকট হইতে সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যগুলির মধ্যে যাহাতে কোন ব্যবধান না থাকে এবং এই দুইয়ের সমন্বয় দ্বারা ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের উপর প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসেও ইহা বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। মৌর্য্য সম্রাট্ অশোকের সময় হইতে বহু শতাব্দী ধরিয়া যে ধর্ম্ম ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সমাজের পুষ্টিসাধনে আপনার অসামান্য পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ভারতেতিহাসের প্রসঙ্গে তাহার কথা বিশেষভাবে বলা আবশ্যক। না বলিলে, ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। সেই জন্য এইখানে আমি ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস বলিতে গেলে আমরা সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে অশোকের সময় পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এবং কনিষ্কের পর হইতে মহাযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতির সামান্য সামান্য অসংলগ্ন ইতিহাস বুঝিয়া থাকি। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় দেড় সহস্র বৎসর কাল বিদ্যমান ছিল এবং এই সময়ে এই ধর্ম্ম কতপ্রকারের আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অনেক সময়ে 'বৌদ্ধ-ধর্ম্ম' এই নাম ব্যতীত বুদ্ধের সেই প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোন সামঞ্জস্যই নাই সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাস বলিতে গেলে উহা কোন্ শতকের বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস তাহা আমাদের বিশেষভাবে বলিয়া দেওয়া উচিত; নতুবা বিশেষ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু প্রতি শতকেও যে একই প্রকারের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ছিল তাহা নহে, একই সময়ে একই স্থানে কত সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বর্ত্তমান ছিল তাহা আপনারা য়ুয়ান্ চুয়াং হইতে দেখিতে পাইবেন; সে জন্য পৃথক্‌ভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলির ইতিহাস লেখাই কর্ত্তব্য। এ কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে পর এই সমস্ত খণ্ডিত ইতিহাস সম্মিলিত করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভব হইবে। সেরূপ ইতিহাস হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে; সে জন্য খণ্ডিত ইতিহাস কিরূপভাবে লিখিতে হইবে সে সম্বন্ধে কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও অসমগ্রদর্শী।

নানাপ্রকারের বৌদ্ধ ধর্ম্মমত।

হীনযান বৌদ্ধ মত সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছে তাহা প্রধানতঃ হীনযানের আঠারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ; সেই সম্প্রদায়ের নাম স্থবিরবাদ বা থেরবাদ। স্বীকার করি যে, স্থবিরবাদিগণ সংখ্যায় অল্প ছিল না, এবং বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের প্রথম কয় শতকে উহারা সম্রাট্ অশোকের পোষকতায় স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল ; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অন্যতম সম্প্রদায় সর্ব্বাস্তিবাদ, কনিষ্কের রাজত্বের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে প্রায় তিনচারি শতক ধরিয়া প্রাধান্য ও সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল ; য়ুয়ান্ চুয়াংএর গণনানুসারে সাংমিতীয়গণ সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল এবং মহাসাংঘিকগণ সংখ্যায় তাদৃশ অধিক না থাকিলেও পরবর্ত্তী কালের মহাযানের পূর্ব্বপুরুষরূপে বিরাজ করিতেছিল।

হীনযান বৌদ্ধ মতের সম্পূর্ণ আলোচনা হয় নাই ; যাহা হইয়াছে তাহা স্থবিরবাদীয়।

স্থবিরবাদী ব্যতীত অন্যান্য তিনটি প্রধান সম্প্রদায়।

আজ যে আমরা স্থবিরবাদিগণের গ্রন্থরাজি বহুল পরিমাণে হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার কারণ এই যে তাহাদের গ্রন্থ সমূহ সিংহলে এবং ব্রহ্ম-দেশে ভারতীয় ভাষাতেই নিরাপদে রক্ষিত হওয়ায় ভারতে বৌদ্ধ-সাহিত্যের ধ্বংসের সময় রক্ষা পাইয়াছিল। ইহার উপর বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিস্ ডেভিড্স্ প্রমুখ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের উদ্যমে স্থবিরবাদীয় পালিগ্রন্থসমূহের বহুল পরিমাণে মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছে। এই কারণে অদ্যাবধি যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আলোচনা হইয়াছে তাহা হীনযানীয় স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের, সমগ্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নহে। এই আংশিক এবং অসমগ্রদর্শী আলোচনাকেই আমরা অনেক সময়ে সমগ্র বৌদ্ধ-সমাজের মতালোচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা বেশ দেখা যায় যে পূর্ব্বোল্লিখিত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থবিরবাদ ব্যতীত অন্য তিনটি সম্প্রদায় কয়েক শতক ব্যাপিয়া বিভিন্ন স্থানে প্রভূত শক্তি ও প্রসার লাভ করিয়া ছিল। ইহারা সকলেই হীনযানভুক্ত হইলেও ইহাদের দার্শনিক মত ও ধর্ম্মবিশ্বাস বিভিন্ন ছিল এবং ইহাদের ধর্ম্মসাহিত্যও যে

স্থবিরবাদীয় বৌদ্ধ মতের আলোচনা হইবার দুই কারণ ;
১। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে পালি ভাষায় রক্ষিত গ্রন্থাবলী।
২। পালি টেক্সট্ সোসাইটীর উদ্যম।

বিভিন্ন ছিল তাহারও প্রমাণ ও আভাস পাইয়া থাকি। অধুনা এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ইতিহাসের দিকে পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। খোটান্, মধ্যএসিয়া প্রভৃতি স্থানের ভূগর্ভ হইতে যে সমস্ত পুথির অংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের বহু সাহিত্য ভারতে লিখিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত চীনা পরিব্রাজকদিগের পুথি-সংগ্রহ হইতে দেখা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেক প্রধান সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সাহিত্য পাইয়াছিলেন এবং তাহা স্বদেশে লইয়া গিয়া স্বীয় ভাষায় অনূদিত করিয়া রাখিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, অভিধর্ম্মপিটকের অন্তর্গত স্থবির-বাদিগণের যে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, সেগুলির নাম এবং উপাদান, সর্ব্বাস্তিবাদিগণের ঐ শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থের সহিত একেবারেই মিলে না। স্থবিরবাদিগণের অভিধর্ম্মের গ্রন্থগুলির নাম হইতেছে (১) ধর্ম্মসঙ্গনী (২) বিভঙ্গ (৩) ধাতুকথা (৪) পুগ্গল পঞ্ঞত্তি (৫) কথাবত্থু (৬) যমক (৭) পট্ঠন; আর সর্ব্বাস্তিবাদিগণের অভিধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীর নাম (১) জ্ঞানপ্রস্থানসূত্র এবং তৎসহ ছয়টী পাদ (১) সঙ্গীত-পর্য্যায় (২) প্রকরণপাদ (৩) বিজ্ঞানকায় (৪) ধাতুকায় (৫) ধর্ম্মস্কন্ধ (৬) প্রজ্ঞাপ্তি-সার। এইরূপ সাংমিতীয় ও মহাসংঘিকদিগেরও যে অভিধর্ম্ম সাহিত্যের পার্থক্য ছিল, চৈনিক পারিব্রাজকদিগের ভ্রমণকাহিনী হইতে আমরা তাহার আভাস পাই; তবে শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম-গ্রন্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। ইহা ব্যতীত বিনয় ও সূত্র পিটক সম্বন্ধে এই চারিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও ছিল। ন্যান্জিয়োর (Nanjio) চৈনিক ত্রিপিটকের তালিকায় আমরা এই চারিটি সম্প্রদায়ের চারিটি পৃথক্ পৃথক্ বিনয় গ্রন্থের অস্তিত্ব জানিতে পারি। এ সম্বন্ধে ওল্ডেন্বার্গ (Oldenberg) লিখিত বিনয়পিটকের ভূমিকায় এবং সোমা কোরোসি (Csoma Korosi) কৃত দুল্ভের (অর্থাৎ তিব্বতীয় বিনয়ের) বিশ্লেষণ হইতে (Asiatic Researches, xx) কিছু জানিতে পারা যায়। এই সকল সম্প্রদায়ের

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ।

এই চারিটী সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটির সাহিত্য ছিল, এবং তাহা বিভিন্ন; দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম সাহিত্যের উল্লেখ।

মতভেদ বিষয়ে ভব্য, বিনীতদেব ও বসুমিত্রের অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায় সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থ হইতে, এবং পালি গ্রন্থ কথাবত্থু ও সিংহলী-গ্রন্থ নিকায়সংগ্রহ হইতে কিছু কিছু জানা যায়। দার্শনিক মত লইয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ অনৈক্য ছিল; সাংমিতীয় সম্প্রদায়ের মত অতিশয় প্রভিন্ন ছিল। তাহারা পুগ্‌গল বা আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ 'আত্মার' অস্তিত্ব মানিতেন না, ইহাই প্রচলিত ধারণা। এখন চীনাভাষায় ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া এই সমস্ত সম্প্রদায়ের যে গ্রন্থাবলী রহিয়াছে তাহার উদ্ধার সাধন করিতে না পারিলে, বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভব হইবে না।

কোথা হইতে আমরা সম্প্রদায়-গুলির মধ্যে পার্থক্য বা তাহাদের ইতি-হাস জানিতে পারি।

ভারত-বহির্ভূত কোন্ কোন্ দেশ, উক্ত অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোনও এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে হইবে। ইহার কারণ এই যে, ভারতীয় বৌদ্ধগণ যখন ধর্ম্ম-প্রচারকল্পে ভারতের বাহিরে যাইতে আরম্ভ করেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের যে সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিল, সেই সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম বিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন; বিদেশীয়রাও সেই ধর্ম্মকেই আদিম বৌদ্ধ ধর্ম্ম বোধে অতি যত্নসহকারে ঐ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম এবং উহার সাহিত্য রক্ষা করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি প্রথমেই সিংহলীদের কথা উল্লেখ করিতেছি। যে সময়ে স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল সেই সময়ে সিংহল বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; তাহার ফলে এই সম্প্রদায়ের সমগ্র সাহিত্য ঐস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। সেইরূপ কনিষ্কের সহায়তায় যখন সর্ব্বাস্তিবাদ প্রাধান্য লাভ করে, তখন খোটান, মধ্যএসিয়া প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়; সেই জন্য অধুনা যে সমস্ত পুথির অংশ ঐস্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে তাহা প্রায়ই সর্ব্বাস্তিবাদিগণের। সাংমিতীয়দিগের সম্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে। যদিও এই সম্প্রদায়ের কোন পুথি বা পুথির অংশ পাওয়া যায় নাই, তথাপি চম্পার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস যেরূপ জানিতে

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত দেশগুলি সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় ইতিহাস সঙ্কলনের কতদূর সাহায্য করিতে পারে।

পারা গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সাংমিতীয় সম্প্রদায় এই স্থানটি প্রথমে অধিকার করিয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনী এই সম্প্রদায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চুয়াংএর ভ্রমণকাহিনী পাঠে জানিতে পারি যে পশ্চিম ভারতে এই সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বর্ত্তমান ছিল এবং বলভি ইহার কেন্দ্র ছিল। উক্ত পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে চম্পার বৌদ্ধেরা প্রায় সকলেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তবে কোন্ সময়ে এবং কোন্ দেশ হইতে চম্পায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, ইহার সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; উহার ফলেই এই সম্প্রদায় পুগ্‌গলের (আত্মার) অস্তিত্ব স্বীকার করে। য়ুয়ান্ চুয়াং বলেন, যে সমস্ত স্থানে সাংমিতীয় সম্প্রদায় দেখা যায়, সেইখানেই শৈব এবং পাশুপত ধর্ম্মাবলম্বিগণের আধিক্য লক্ষিত হয়। চম্পায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষতঃ শৈব ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। চম্পার খোদিত লিপিসমূহ হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থানের বৌদ্ধধর্ম্ম, মহাযান ও শৈব ধর্ম্মের সংমিশ্রনের ফল। চৈনিক ইতিবৃত্ত (Chinese Annals) হইতে জানিতে পারা যায় যে ৬০৫ খৃষ্টাব্দে, ১৩৫০ খানি বৌদ্ধ পুস্তক চীনারা চম্পা হইতে লইয়া যায় (Eliot's Hinduism and Buddhism Vol. III, p. 148)। এসমস্ত তথ্য হইতে ধারণা হয় যে চম্পার বৌদ্ধধর্ম্মের বিবরণ বিশেষ ভাবে জানিতে পারিলে আমরা সাংমিতীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস পাইব। ঐ সম্প্রদায়ের অনেক পুথি য়ুয়ান্ চুয়াং ভারত হইতে চীন দেশে লইয়া গিয়া অনুবাদ করান; কিন্তু ন্যান্‌জিয়োর তালিকায় বিনয়পিটক ব্যতীত অন্য কোন পুথি ইহাদের স্বকীয় বলিয়া উল্লেখ নাই। এই সম্প্রদায় হইতে মহাযানধর্ম্ম অনেক তথ্য গ্রহণ করিয়াছে। য়ুয়ান্ চুয়াং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে এই সম্প্রদায়ের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বাঙ্গালা দেশে বাস করিত। মহাসাংঘিক সম্প্রদায় কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। তবে মনে হয় যে দক্ষিণ ভারতেই ইহারা প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, কারণ এই সম্প্রদায় হইতে যে সমস্ত উপসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাদের

সাংমিতীয় সম্প্রদায়।

মহাসাংঘিক সম্প্রদায়।

পৃষ্ঠপোষকগণ যে দক্ষিণ ভারতেই অবস্থান করিতেছিলেন তাহা অমরাবতী কার্লে প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ পুরাবস্তু হইতে জানিতে পারা যায়। এ সম্প্রদায়ের ইতিহাস যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কারণ এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণই প্রথমে বুদ্ধকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন ও ধারণীগুলিকে পিটকে স্থান প্রদান করেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে ইহারাই পরবর্ত্তী মহাযানধর্ম্মের পথ উন্মুক্ত করেন; সেই জন্য মহাযানের উৎপত্তি জানিতে হইলে, কি ভাবে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের ক্রমবিকাশ হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্য বা অন্যান্য ধর্ম্মের প্রভাব ইহার উপর কি পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা জানা আবশ্যক। চীনদেশে রক্ষিত পুথিসমূহের মধ্যে মহাসাংঘিকদিগের 'বিনয়' ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ ইহাদের স্বকীয় বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই; তবে য়ুয়ান্ চুয়াং এই সম্প্রদায়ের পনর খানি গ্রন্থ ভারত হইতে লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত পুথি এখনও চীনদেশে আছে, তবে কোনগুলি মহাসাংঘিকদিগের তাহা নির্ণীত হয় নাই। ঐ সমস্ত পুথি নির্ণয় করা এবং চীন ভাষা হইতে উহাদের অনুবাদ বা সারসংগ্রহ করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। যতদিন না এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, ততদিন মহাসাংঘিকদিগের ইতিহাস উদ্ধার করিবার আশা নাই।

সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়।

সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমার বিশেষ বলিবার কিছু নাই, কারণ পণ্ডিতগণ ইহার ধারাবাহিক বিবরণের আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন; দুই একজন এ সম্বন্ধে গ্রন্থাদিও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে লা ভালি পুস্যাঙ্ (La Vallee Poussin), য়ামাকামি সোসেন (Yamakami Sogen) ও তাকাকুসু (Takakusu)র নাম উল্লেখ-যোগ্য।

স্থবিরবাদ সম্প্রদায়।

ইহার পর স্থবিরবাদের কথা। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য মনে করি, কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পালি-সাহিত্য পাঠে যে সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহার উপকরণ প্রধানতঃ এই সম্প্রদায় হইতে গৃহীত। তবে পালি-সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। প্রধানতঃ কাল হিসাবে

পালি-সাহিত্যের পারম্পর্য্য আজ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই; ভিন্টারনিটস্ (Winternitz) এ সম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু অনুসন্ধান করিবার এখনও অনেক বিষয় অবশিষ্ট রহিয়াছে। বোধ হয় অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাহিত্য কিছু কিছু পাওয়া না গেলে এবং সেগুলির সহিত পালি-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা না করিলে সময়ের পারম্পর্য্য অবধারণ করা সম্ভব হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্ব্বাস্তিবাদীয় ও স্থবিরবাদীয় অভিধর্ম্মের কথা বলা যাইতে পারে। এই দুই সম্প্রদায়ের অভিধর্ম্ম দেখিলে কিরূপে অভিধম্মসাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কতকটা স্থির করা যাইতে পারে। (১)

পালি-সাহিত্যের কাল হিসাবে পারম্পর্য্যের অভাব।

অদ্যাবধি পালি-অভিধর্ম্ম সাহিত্যের ভালরূপ আলোচনা হয় নাই। এই সাহিত্যের সম্পাদন কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং কোন কোন পুস্তকের অট্ঠকথা অর্থাৎ টীকাও প্রকাশিত হইয়াছে। মিসেস্ রিজ ডেভিড্স্ (Rhys Davids) প্রমুখ দুই একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিত এই সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে কেহ এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই। আজকাল ব্রহ্মদেশের পণ্ডিত মং সোয়ে জান্ আউঙ্ (Maung Shwe Zan Aung) ও মং টিঙ্ (Maung Tin) এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন। ইহার আলোচনায় দুইটি প্রতিবন্ধক আছে :—প্রথমতঃ অভিধর্ম্মের আলোচনা ভারত হইতে লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল ব্রহ্মদেশে; দ্বিতীয়তঃ পালিভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থগুলি ও তাহার অট্ঠকথা এই সাহিত্য বুঝিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বহুকাল হইতে ত্রিপিটকের মধ্যে অভিধর্ম্ম পিটকেই বিশেষজ্ঞ। এখনও তাঁহারা বহুকাল প্রচলিত প্রথানুসারে, রাত্রে এ বিষয়ের শিক্ষা দিয়া থাকেন। এ বিষয়টি আয়ত্ত করিতে হইলে ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, কারণ ঐদেশের পণ্ডিত-

পালি অভিধর্ম্ম-পিটকের আলোচনার অভাব।

(১) অধ্যাপক তাকাকুসু সর্ব্বাস্তিবাদীয় অভিধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়াছেন Journal of the Pali Text Society, (১৯০৫ পৃঃ ৬৭—১৪৭)

গণ এই সাহিত্যের উপর ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনেক টীকা টিপ্পনী,—'লেথান' (Lethan বা Little-finger Manuals), নিস্সয় (Nissayas বা Burmese trsnslations) লিখিয়া গিয়াছেন। মং সায়ে জান্ আউঙ্ বলেন যে, ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় ধর্ম্মসঙ্গনীর ২২ খানি অনুবাদ আছে। আভা (Ava) ও সাগ্যাইং (Sagaing) জেলায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫০ এর মধ্যে অনেক বিখ্যাত টীকাকার অভিধর্ম্ম পিটকের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত জিনিস ব্রহ্মদেশ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে আমাদের পক্ষে অভিধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ সম্ভব হইবে না। ভারতীয় বৌদ্ধগণ মনোবিজ্ঞানে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা এ পুস্তকগুলি পড়িলেই বুঝা যায়। অভিধর্ম্ম পরিহার করিলে বৌদ্ধধর্ম্মের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বৌদ্ধ-প্রণালীতে যোগাভ্যাস করিলে মানসিক বৃত্তিগুলি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা অভিধর্ম্ম না বুঝিলে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

ব্রহ্মদেশে অভিধর্ম্মের আলোচনা।

এই অভিধর্ম্ম ব্যতীত পালি-সাহিত্যের এমন অনেক পুস্তক আছে যাহার সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে পরবর্ত্তী কালে বহু পালিগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহা আপনারা Gandhavamsa (অর্থাৎ গ্রন্থবংশ) এবং মেবেল বোডের (Mabel Bode) Pali Literature in Burma পাঠে অবগত হইতে পারেন। এই সমস্ত গ্রন্থ পিটকের অন্তর্ভুক্ত নহে; সেইজন্য ঐগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকৃষ্ট হয় নাই। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারি।

পিটক ব্যতীত অন্যান্য অনেক পালিগ্রন্থ আছে যাহার আলোচনা হয় নাই।

অশোকের সময় হইতে নাগার্জ্জুনের সময় (খৃঃ ২য় শতক) পর্য্যন্ত অর্থাৎ চারি শত বৎসর, হীনযানের সমৃদ্ধির সময় বলা যাইতে পারে। ইহার পর মহাযানের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ক্রমশঃ এই মহাযান হীনযানকে হীনবীর্য্য করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। প্রায় এক সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই মহাযানের প্রাধান্য, ভারত, তিব্বত, চীন

সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা হইয়াছে কিন্তু সৌত্রান্তিক এবং যোগাচার সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। সেই জন্য এই দুই শাখার দার্শনিক মত সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মে যোগের স্থান।

বৌদ্ধধর্ম্মে যোগ যে একটি প্রধান অঙ্গ তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত পালি গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া বলেন যে, উহাতে নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নাই। দীঘনিকায়ে 'সতিপট্ঠনসুত্তন্ত' মাত্র দেখিলে বোধগম্য হয় যে, বৌদ্ধদের যোগাভ্যাস ব্যাপারটি খুব বেশী পরিমাণে ছিল। ধ্যান ও সমাধির কথা যে কোন বৌদ্ধগ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টাইলেই দেখা যায়। বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির দুইটি মার্গ ছিল; একটির নাম 'গ্রন্থধুর' অর্থাৎ গ্রন্থ বা পিটক অনুশীলন ও ধর্ম্মাদেশনা প্রভৃতি কার্য্য; অপরটি "বিপস্সনাধুর" অর্থাৎ কেবল (গ্রন্থাভ্যাস না করিয়া) 'বিপস্সনা' (ধ্যান) দ্বারা মুক্তি-লাভ। এই শেষোক্ত পন্থাবলম্বীকে প্রথম হইতে ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইতে হয়। হীনযানীয়দিগের 'অট্ঠসমাপত্তি' বা মহাযানীয়দিগের 'দশভূমি', এ সমস্তই বৌদ্ধ যোগের কথা। বৌদ্ধধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ই বিষয়টিকে অতি ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে; ইহা বুঝাইবার জন্য বহু গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষ 'বিশুদ্ধি মগ্গে' এই যোগের ব্যাপারটি বিশদ্ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে এই বিষয় লইয়া অনেক গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছে, মং সোয়ে জান আউঙ্ (Mauug Shwe Zan Aung) এর অভিধম্মত্থসঙ্গহের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা এবং সিংহলের Yogavacara's Manual হইতে এই হীনযানীয় যোগ সম্বন্ধে কিছু আভাস পাওয়া যায়। মহাযান বৌদ্ধেরা যে যোগ ব্যাপারটি খুব বেশী পরিমাণে চর্চ্চা করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। মহাযানীয় প্রায় সকল পুস্তকেই 'যোগ' সম্বন্ধে কিছু না কিছু কথা আছে; তাহা ছাড়া তাহাদের 'নবধর্ম্মের' মধ্যেই "দশভূমীশ্বর" নামক একখানি বিপুল গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহা ভিন্ন 'সামাধিরাজ' বলিয়া আরও একখানি গ্রন্থ হজ্সন্ গ্রন্থ-সংগ্রহে (Hodgson Collection) রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী কালের মহাযানীয় এক সম্প্রদায় 'যোগাচার' নামেই অভিহিত হয়; এই সম্প্রদায় যোগাভ্যাসের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিল। এ সম্প্রদায়ের প্রধান মনীষী অসঙ্গ 'যোগাচার ভূমিশাস্ত্র' লিখিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। চীনা ভাষায় অনূদিত যোগ সম্বন্ধীয় দুইখানি পুথি ন্যান্‌জিয়োর তালিকায় (পুথি নং ১৫১০, ১৫১৫) দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের যোগ সম্বন্ধীয় নিয়মাদি নানা স্তরের মানসিক অবস্থা, যোগের অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বিষয় ও পরিভাষার সহিত হিন্দু যোগশাস্ত্রের বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ই যোগসাধন করিয়া থাকে। বৌদ্ধগণের যোগসম্বন্ধীয় পুস্তকের অভাব নাই; তবে বিষয়টি লইয়া ভালরূপ চর্চ্চা হয় নাই কেবল পুস্তক হইতে এই ব্যাপারের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করা যায় না, উহার অনেক জিনিষ গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে এবং সেগুলি সাধারণের অগোচরে রহিয়াছে। তথাপি যতদূর সম্ভব যোগসম্বন্ধে বৌদ্ধ উক্তি ও গ্রন্থ একত্র করিয়া তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা উচিত, কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা বা তাহার ক্রমবিকাশ জানিবার জন্য উহা বিশেষ সাহায্য করিবে।

এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী কালের মহাযানীয় এক সম্প্রদায়ের কথা বলা আবশ্যক। দক্ষিণ ভারতে খুব সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায় গঠিত হয়; ধ্যান, ধারণা, সমাধি ইঁহাদের নিকট নির্ব্বাণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়া গৃহীত হয়। এই সম্প্রদায়ের সংস্কৃত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষ হইতেও কিছু জানা যায় না। এই সম্প্রদায়ের অষ্টাবিংশতিতম ধর্ম্মাধিনায়ক বোধিধর্ম্ম দক্ষিণ ভারত হইতে জলযানে চীনদেশে গমন করেন এবং তথায় Tien tai (ধ্যানী) নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমে অতিশয় বাধা বিঘ্ন পাইলেও তিনি এই সম্প্রদায়কে চীনে স্থায়ী করিতে সমর্থ হন। কালে চীনদেশে এবং তৎপরে জাপানে এই সম্প্রদায় বিস্তৃতি লাভ করে; ইহার ইতিহাস হইতে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের আচার্য্যগণের পরম্পরা প্রাপ্ত হই এই আচার্য্যপরম্পরার ইতিহাস চীনা ভাষায়

ধ্যানী সম্প্রদায়

প্রভৃতি স্থানে অক্ষুণ্ণ ছিল। মহাযানের গুরুত্বের অনুপাতে বর্ত্তমান সময়ে এই সম্বন্ধে যে গবেষণা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। বরং হীনযান সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক গবেষণা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পালি টেক্‌স্‌ট সোসাইটির (Pali Text Society) উদ্যমে হীনযানীয় বহু পালি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মহাযানের অভ্যুদয় কিরূপে হইয়াছিল, তাহা অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন। মহাসাংঘিক সম্প্রদায় হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না। মহাসাংঘিকদিগের পরবর্ত্তী চৈত্যবাদী, লোকোত্তরবাদী, প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মতগুলির মধ্য দিয়া মহাযানের পরিণতির ক্রম জানা আবশ্যক। তাহার পর, মহাবৈপুল্যসূত্রের অন্তর্গত মাত্র দুই তিন খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি এখনও পুথির আকারে আছে। এগুলিকে এখনও সম্যক্‌-ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা হয় নাই। মহাযানের উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছিল, এই পুথিগুলি হইতে তাহা বোধ হয় আরও বিশদ্‌-ভাবে জানা যাইতে পারে।

মহাজান সম্বন্ধে গবেষণা অপেক্ষাকৃত অল্প হইবার কারণ।

মহাযানীয় মহা-বৈপুল্যসূত্রের প্রকাশ ও আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম কনিষ্কের পর প্রচলিত হয়। অশ্বঘোষই প্রথমে এই মহাযান ধর্ম্ম তাঁহার 'শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্র' (*The Awakening of Faith* translated from Chinese T. Suzuki) ও অন্যান্য গ্রন্থে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার কিছুদিন পরে ইহা এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হয়। নাগার্জ্জুন এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মাধ্যমিক শাখার, এবং অসঙ্গ যোগাচার শাখার উদ্ভাবন করেন। এই দুই শাখার দার্শনিক অংশের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকিলেও, উভয়েই মহাযান ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও প্রচারকল্পে বহু পুস্তকাদি লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের পরে অন্যান্য অনেক প্রথিতনামা বৌদ্ধ-পণ্ডিত এই দুই শাখাভুক্ত ধর্ম্মমতের আলোচনা করিয়াছেন। মহাব্যুৎপত্তি, মাধ্যমিকবৃত্তি, ন্যানৃজিয়োর তালিকা প্রভৃতিতে তাঁহাদের রচিত বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অনেক পুস্তক চীনা ও তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে, এবং কোন কোন গ্রন্থের সংস্কৃতও আছে। এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে মহাযান ধর্ম্মের পূর্ণাঙ্গীণ অবস্থা

মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের যুগ। ঐ সময়ে ভারতের মনীষিগণ এই ধর্ম্ম ও ইহার দর্শনের আলোচনায় তাঁহাদের মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন; ইহার ফলে চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশের দৃষ্টি ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার পূর্ব্ব হইতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেও, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই চীনাদের, ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শনের জন্য আগ্রহ অতিশয় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহারই ফলে, চীনারা ঐ সময়ের যতগুলি বৌদ্ধপুস্তক মূল্যবান বলিয়া জানিতে পারে, সেগুলি আপনার দেশে লইয়া গিয়া এই দেশের পণ্ডিতের সাহায্যেই তাহাদের দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া সংরক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ঐ সময়ে ভারতে মহাযান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের যুগ সেই জন্য তাহাদের দেশ এই মহাযান ধর্ম্মে প্লাবিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধর্ম্মের পুস্তকাদি বহুল পরিমাণে তথায় সংগৃহীত হইতে থাকে। তাহারা অন্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ যে লইয়া যায় নাই তাহা নহে, তবে মহাযান ধর্ম্মের দিকে তাহাদের বেশী দৃষ্টি থাকায় তাহারা মহাযান গ্রন্থই বেশী সংখ্যায় লইয়া গিয়াছিল। সুজুকী (Suzuki) তাঁহার Outlines of Mahayana Buddhismএর পরিশিষ্টে বলেন,—যে সমস্ত চীনা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ আছে, সেগুলির বিশ্লেষণ বিশেষ আবশ্যক; কারণ এগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ব্যতীত হিন্দু সভ্যতার অনেক আভাস পাওয়া যায়।

মহাযান ধর্ম্মের ইতিহাস ও মহাযানগ্রন্থের অনুবাদ সমূহের জন্য চিনাদের নিকট ভারত কতপ্রকারে ঋণী।

মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হীনযান লোপ পায় নাই। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি ধারা প্রবাহিত হয়, একটি মহাযান ও তৎসহ দুই দার্শনিক মত মাধ্যমিক ও যোগাচার, এবং অপরটি পুরাতন হীনযান ধর্ম্মের রূপান্তর। এই হীনযান ধর্ম্মের দুইটি দার্শনিক মত ছিল, সৌত্রান্তিক এবং বৈভাষিক। যে অষ্টাদশ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি এ সময়ে জীবিত ছিল, তবে তাহাদিগেরই মধ্যে সর্ব্বাস্তিবাদ বৈভাষিক নামে, ও অন্য কয়েকটি মতের সমষ্টি সৌত্রান্তিক নামে পরিচিত হয়। এই চারিটি দার্শনিক মত লইয়া তদানীন্তন পণ্ডিতগণের মধ্য বহু তর্ক-বিতর্ক চলিত, ও তাহার ফলে প্রত্যেকটিরই নূতন নূতন সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। বৈভাষিক ও মাধ্যমিক

আজ Hoernle, Le Coq, Sylvain Levi, Grunwedel, Stein প্রভৃতি য়ুরোপীয়দিগের উদ্যমে মধ্য এসিয়ার ভূ-গর্ভ হইতে অনেক পুথি ও পুথির ছিন্নাংশ, বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, স্তূপ প্রভৃতি নানাপুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্বাস্তিবাদ তথায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য হীনযান বা মহাযান সম্প্রদায়ও তথায় কিছু কিছু থাকিতেও পারে। আজ সেখানে যে সমস্ত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে, পিটক কেবল পালি ভাষায় লিখিত হয় নাই; সংস্কৃত ভাষাতেও পালি ভাষার ন্যায় আর একখানি পিটক ছিল এবং চীনারা এই পিটকের অধিক সংবাদ রাখিত এবং এগুলিকে অনুবাদ করিত। পালিগ্রন্থ তাহাদের যৎসামান্য করায়ত্ত হইয়াছিল। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারিলে আমরা সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের এবং খৃষ্টীয় প্রথম তিন চারি শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কি ধর্ম্মবিশ্বাস, কি পূজাপদ্ধতি, কি ভাষা, কি সভ্যতা, কি স্থাপত্য শিল্প, কি গ্রন্থ বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল তাহা জানিতে পারিব।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় পিটক।

চীনাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম জানিতে হইলে চীনদেশের আশ্রয় লইতে হইবে, কারণ মহাযান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সময়ে চীন ও ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ও বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে চীনারা সাদরে লইয়া গিয়া যথেষ্ট সম্মান করে ও তাহাদের বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ অনুবাদ করাইয়া লয়। চীনের রাজগণ এবিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন; তাই অর্থের বন্দোবস্তের অভাব হয় নাই। চীনারা ভারতীয় পণ্ডিতদিগকে যে কতদূর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা তাহাদের কতকগুলি পুথি হইতে বেশ বুঝা যায়।

চীনারা ভারত ইতিহাস উদ্ধার কার্য্যে কি সাহায্য করিতে পারেন।

ন্যানজিয়োর তালিকায় পরে পরে তিনখানি পুথি পাওয়া যায়। ইহার প্রথম খানির নম্বর ১৬৯০, ইহা ৫১৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ইহাতে ২৫৭ জন ভিক্ষুর জীবনচরিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে আনুষঙ্গিক ভাবে ২৩৯ জন ভিক্ষুর নামও পাওয়া যায়। ইঁহারা ৬৭ হইতে ৫১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীন দেশে বসবাস করিয়া-

ছিলেন। দ্বিতীয় পুথিখানির নম্বর ১৪৯৩; ইহাতে ৩৩০ জন ভিক্ষুর জীবনবৃত্তান্ত এবং আনুষঙ্গিক ভাবে ১৬০ জন ভিক্ষুর নাম উল্লেখ আছে। ইঁহারাও ৫১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তৃতীয় পুথিখানির নম্বর ১৪৯৫; ইহাতে আরও ভিক্ষুর নাম সংযোজিত করা হইয়াছে। চীনবাসিগণ ভারতবর্ষ হইতে যেমন অনেক পণ্ডিত লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা তেমনি নিজেদের দেশ হইতেও ভারতবর্ষে অনেক পণ্ডিত পাঠাইয়াছিলেন। ৬৯২ খৃষ্টাব্দে ইচিং ভারতবর্ষ হইতে একখানি (ন্যান্‌জিওর তালিকার ১৪৯০ সংখ্যক পুথি) পুথি চীনদেশে পাঠান। ঐ চীন দেশ হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ-ভিক্ষু ভারতে ও ভারতবর্ষের সন্নিকটস্থ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, ঐ পুথিতে তাঁহাদের জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জন্য বহুগ্রন্থ চীনা-ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-সংক্রান্ত দুই একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি, যথা— শাক্যবংশের ঐতিহাসিক বিবরণ (ন্যান্‌জিয়ো ১৪৬৮নং), বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কীয় বিবরণসংগ্রহ (ন্যান্‌জিয়ো ১৪৭৯ ও ১৪৮১ নং)

কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপে, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ।

কম্বোজ, চম্পা, এবং যবদ্বীপে, হিন্দু ও বৌদ্ধ কোন্ সময়ে উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন, ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপীড়িত হওয়ায় ঐ সমস্ত দেশে বৌদ্ধভিক্ষুগণ আশ্রয় লইয়াছিলেন, কাহারও বা ধারণা যে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ একসঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে ঐ সমস্ত দেশে গিয়াছিলেন; কেহ কেহ মনে করেন, রাজ্য জয় করিবার মানসে বা ব্যবসায় উপলক্ষে ভারতবাসীদিগের উক্ত দেশসমূহে যাতায়াত ছিল এবং কালক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এগুলির কোন একটি বা সবগুলি কারণই যে ঠিক, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে দেখা যাইতেছে যে, কম্বোজ, চম্পা, এবং যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দুই প্রকার ধর্ম্মই খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে-ছিল এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বৈরীভাব ছিল না। কারণ যে সময় আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার অনুমান করিতেছি, সে সময়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল; তখন মহাযানের পূর্ণশক্তি বর্ত্তমান এবং মহাযানীয় ধর্ম্ম সেই শুষ্ক প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম নহে। তাহার মধ্যে পূজা, ভক্তি প্রভৃতি অনেক

লিখিত হইয়াছে। ন্যান্‌জিওর তালিকায় ১৩৪০, ১৫২৪, ২৫২৬, ১৫২৯, ১৫৫৮, ১৬৫৫, সংখ্যার পুথিগুলিতে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। এইগুলিতে 'ধ্যানী সম্প্রদায়ের আচার্য্য পরম্পরার প্রয়োজনীয় বিবরণ আছে। ১৩৪০ সংখ্যার পুথিতে মহাকশ্যপ হইতে ভিক্ষুসিংহ পর্য্যন্ত তেইশজন ধর্ম্মাধিনায়কগণের অনুক্রমের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এইরূপ আচার্য্য পরম্পরার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকায় মনে হয় যে যোগ সম্বন্ধীয় অনেক জিনিষ গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিত। বৌদ্ধযুগের এই ইতিহাস আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মেও যোগই প্রধান স্থান অধিকার করে। তবে তাহাতে অনেক স্থলে প্রাচীন যোগাভ্যাসের পবিত্রতা রক্ষিত হয় নাই।

চীনা ভাষায় এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস

ভারতবাসীরা যে কখন ভারতের বাহিরে রাজ্যজয়ের জন্য বহির্গত হন নাই, ইহা ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু তাঁহারা বিনা রক্তপাতে যে দেশ জয় করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভারতের বাহিরে বহুদূরস্থিত স্থানে ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে ভারত-বাসীর গৌরব অন্য জাতির গৌরব অপেক্ষা যে কত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অশোক ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন করিবার মহতী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশে যে প্রচারক পাঠাইয়া-ছিলেন তদ্দ্বারাই বিদেশীয়দিগের নিকট ভারতবর্ষ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি এই প্রকার ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া যান এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ভারতবাসীরা তাঁহার এই সদুদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। সেজন্য এখন ভারতের ইতিহাস বলিতে গেলে আমাদের ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। আমাদের দেখিতে হইবে যে তৎকালীন ভারতবাসিগণ কোন্ কোন্ দেশে এবং কিরূপভাবে ভারতের ধর্ম্ম, শিক্ষা, ও সভ্যতা বিদেশীয়-দিগের মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া বিদেশীয়দিগকে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া হিন্দু-রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা ভারতের ইতিহাসে

ভারতের ইতিহাস ভারতের উপনিবেশের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত।

কুষাণদের কীর্ত্তিকলাপ জানিতে চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতবাসীরা কুষাণদের রাজ্যে গিয়া কি স্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও জানা আবশ্যক। শুধু কুষাণদের রাজ্য কেন, Central Asia, China, Java, Cambidia, Siam, Ceylon, Burma, Tibet প্রভৃতি দেশে গিয়া তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং কোন কোন স্থানে ধর্ম্মরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরাজত্বও স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমস্ত দেশের প্রত্যেকটিতে ভারতবাসী কোন্ সময়ে গিয়াছিল এবং তথায় কি করিয়াছিল ইহা একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। তৎপরে ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসের জন্য, বিশেষতঃ বৌদ্ধ ইতিহাসের জন্য, এ সমস্ত উপনিবেশের সংবাদ লওয়া আবশ্যক। কারণ ভারতের যে প্রদেশের লোক দ্বারা বহির্ভারতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই উপনিবেশে তাহারা যে ধর্ম্মশিক্ষা বা সভ্যতা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম, সেই শিক্ষা ও সেই সভ্যতা যে তাহাদের আপনাদের দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। সেই জন্য যদি ভারতের উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাস পাই, তাহা হইলে ভারতের বিভিন্ন সময়ের শিক্ষা ও সভ্যতার কিছু কিছু ইতিহাস পাইব। এইরূপ ইতিহাস সম্বন্ধে Eliot সাহেব তাঁহার Hinduism and Buddhism এর তৃতীয় খণ্ডে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় দিয়াছেন এবং অনেক German, French, Dutch, Russian ভাষায় লিখিত এই প্রকার ঐতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক উপকরণ ঐ সমস্ত উপনিবেশের ইতিহাস হইতে আমরা পাইতে পারি।

অশোকের সময় হইতে গান্ধার ও মধ্য-এসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা চলিয়াছিল। তবে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ঐস্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণ আকার ধারণ করে কাশ্মীরে বা উত্তর পশ্চিম ভারত-প্রান্তে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ই এ সময়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; তাই দেখা যায় যে মধ্যএসিয়ায় এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ঐ উপনিবেশে নীত হয়। খোটানে মহাযান ধর্ম্মও ছিল।

মধ্য এসিয়ায় ভারতের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনা

ঐতিহাসিকগণ সেজন্য মনে করেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি ধারা মধ্যএসিয়ায় প্রবেশ লাভ করে। প্রাচীনটি সর্ব্বাস্তিবাদ, এবং দ্বিতীয়টি মহাযান ধর্ম্ম।

জিনিস প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেগুলি প্রায়ই সমসাময়িক হিন্দু ধর্ম্মের দান। এ সময়ে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের পরিণতির যুগ এবং এই দুই ধর্ম্ম জাগিয়া উঠিতেছিল। বিশেষতঃ উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে এই দুই ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে এ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম কতদূর কি করিয়াছিল তাহার ইতিহাস আমরা পাই না। অমরাবতী ও কার্লে স্তূপের সংবাদ আমরা পাইয়াছি। বহু অর্থব্যয় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ কারুকার্য্যময় এই স্তূপসমূহ দেখিয়া মনে হয় যে, দক্ষিণ ভারতেরও কোন কোন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মও বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কথাবথুর অট্ঠকথা এবং অন্যান্য পালি গ্রন্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলি সম্প্রদায়কে "অন্ধক" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইত। আমরা অমরাবতী স্তূপে 'পূর্ব্বশৈল'ও 'অপরশৈল' সম্প্রদায়ের নাম পাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথিতনামা ভিক্ষু আর্য্যদেব, দিগ্‌নাগ, ধর্ম্মপাল প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের লোক। এই প্রমাণ হইতে বুঝা যায় দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। মণিমেখল, শিলপ্পধিকারম্, কুণ্ডলকেশী, নীলকেশীতেরুট্টু নামক তামিল গ্রন্থে (Indian Antiquary Vol. 37) বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানিবারও আছে। এইরূপ তামিল গ্রন্থ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মহাবংশে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের রাজাদের মধ্যে রাজ্য ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত যে বিবাদ-বিসংবাদ চলিয়াছিল, তাহার বিবরণ হইতেও দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম।

নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও তাহার ইতিহাস বিশেষ মূল্যবান ; ইহা দ্বারা ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ও উহার আভ্যন্তরীণ তথ্যগুলি বুঝিতে পারা যাইবে। একখানিও মহাযানীয় বৌদ্ধশাস্ত্র আমরা ভারতে পাই নাই, এই বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র ও এরূপ বিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে এমন অপসারিত হইল যে, তাহার একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। গবেষণাকারিগণ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্র মুসলমান কর্তৃক সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছে। ভিক্ষুগণ যাহা নেপালে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই রক্ষা পাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কতকটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের অত্যাচারের এবং কতকটা হিন্দু ধর্ম্মের পেষণে লোপ পাইয়াছে। তাহারা বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আচার,-ব্যবহার

ও পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি অনেক জিনিস প্রচ্ছন্নভাবে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। এখন আমার বক্তব্য এই যে, নেপাল ও তিব্বতের সাহায্য না পাইলে আমরা বৌদ্ধ ইতিহাস সম্বন্ধে এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। নেপালে খুব সম্ভব অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তবে একাধিপত্য কোন কালেই করিতে পারে নাই; নেপালে দেশীয় ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুন্ন ছিল; তারপর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মও কতকটা সেখানে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক নেপাল আশ্রয়প্রার্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে এবং বৌদ্ধ পুথিগুলিকে স্থান দান করিয়া ভারতবর্ষকে চিরদিনের জন্য ঋণী করিয়া রাখিয়াছে। নেপাল হইতে যে কত পুথি পাওয়া গিয়াছে এবং সে গুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর আমার বলিবার কিছু নাই।

তারপর তিব্বতের কথা। তিব্বতের কাছে ভারতবর্ষ আর এক কারণে ঋণী। ভারতের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থান হইলেও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক পরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা Srong btsan Gam Por নেপালী ও চীনা রাণীদের আনুকূল্যে বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালে স্থান পায়। কিন্তু এ সময়ের বৌদ্ধধর্ম্ম অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন ও অসঙ্গের সেই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ছিল না। এ সময়ে উহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল—মন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি ধর্ম্ম মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম নাম দিয়া প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে জন্য তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রধানতঃ মহাযানের এই রূপান্তরিত অবস্থা তাহা বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম ৭ম শতাব্দীতে কি ভাবে ভারতে অবস্থান করিতেছিল, তাহা জানিবার উপায় তিব্বতের ইতিহাসে রহিয়াছে। তিব্বতীয়েরাও চীনাদের মত বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিল, তাহারা স্বদেশের শিক্ষার্থীদিগকে ভারতে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার জন্য পাঠাইত এবং ভারত হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিত লইয়া যাইত। চীনাদের অপেক্ষা তাহাদের অনুবাদে বিশেষত্ব আছে। তাহাদের অনুবাদগুলি এতই আক্ষরিক যে তাহাদের অনুবাদ হইতে মূল সংস্কৃতও অনেকটা উদ্ধার করা যাইতে পারে। অধিকন্তু তাহারা অনুবাদগুলি মূলের অনুরূপ রাখিয়াছে, এবং ভারতীয় শব্দভাণ্ডার যথাযথ ভাবে রক্ষা করিবার জন্য তিব্বতীয়-

সংস্কৃত শব্দকোষের সৃষ্টি করিয়াছে। এই শব্দকোষ এখন সেই অনুবাদগুলির মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে বিশেষ কার্য্যকরী হইতেছে। পদ্মসম্ভব বা পদ্মকরের মঠাধিকারিত্বের সময়ে ৭৫৭ খৃঃ তিব্বতের এই সাহিত্যের চর্চ্চা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হইয়াছিল। পদ্মসম্ভব একজন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিব্বতীয়দিগের বৌদ্ধ পুথিসংগ্রহ চীনাদের অপেক্ষা কম ছিল না। তবে মহাযান এবং পরবর্ত্তী কালের মহাযানীয় তন্ত্রশাস্ত্রের উপর ইঁহাদের অধিকতর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। হীনযানীয় গ্রন্থ তাঁহারা অনুবাদ করিয়াছেন বটে, তবে মহাযানীয় ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের সংখ্যার তুলনায় সেগুলি নিতান্ত অল্প। (Asiatic Researches Vol. xx; P. Cordier, Catalogue du Fonds Tibetain, 2 Vols).

তিব্বতে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের উপকরণ।

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় বাঙ্গালার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের সমৃদ্ধির যুগ। সেই কারণে তিব্বতে এই ধর্ম্মসম্পর্কীয় বহু গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। বৌদ্ধতন্ত্র ও বাঙ্গালার তৎকালীন বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা বুঝিতে হইলে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া আবশুক। এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ইত্যাদি নাম দিয়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্ম্ম নানাভাবে অবস্থান করিতেছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালার বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" নাম দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অল্পদিন হইল 'অদ্বয়বজ্রের' ছোট ছোট কুড়ি খানি পুথি পাইয়াছেন। সেগুলি এমন করিয়া পর পর সাজান যে তাহা হইতে বাঙ্গালী বৌদ্ধদিগের মতবাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁহার দুইখানি পুস্তকে সংগ্রহ করিয়াছেন।

চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ বাঙ্গালাদেশে হীনযানীয় এবং মহাযানীয় বহু বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধ বিহার দেখিয়াছিলেন। য়ুয়ান্ চুয়াংএর বিবরণ হইতে দেখা

যায় যে, বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরও বাস ছিল। বাঙ্গালাদেশ বহু সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠানভূমি ছিল, এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি এই নানাসম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সমাবেশেই উদ্ভূত হইয়াছিল। আপাত-দৃষ্টিতে আমরা এই তন্ত্রধর্ম্মকে যেরূপ চক্ষেই দেখি না কেন, ইহার মধ্যে অনেক ভাল জিনিস নিহিত আছে।

বাঙ্গালাদেশে নানা-সম্প্রদায়ের স্থান। তান্ত্রিক ধর্ম্মে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বহু বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ;

Avalon সাহেব তন্ত্রশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা তন্ত্রশাস্ত্র বুঝিবার পথকে সরল ও সুগম করিয়া দিবে।

ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সম্বন্ধে বহু কারণের নির্দ্দেশ করেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন ও তাহার অপব্যবহারই তন্মধ্যে অন্যতম। তারপর দেশীয় নরপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অত্যাচার প্রভৃতি আরও অনেক কারণ আছে। কি কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইল, তাহার নির্দ্ধারণের জন্য বিশেষ গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালা দেশে প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পাইলেও ইহা প্রচ্ছন্নভাবে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া আছে। বাঙ্গালার সহজিয়া সম্প্রদায়, ধর্ম্ম সম্প্রদায় (ধর্ম্মপূজকগণ), ও শৈব সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে লুপ্তাবশিষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ধর্ম্মমঙ্গল, গম্ভীরার গান প্রভৃতি পাঠে আমরা ইহার প্রমাণ পাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের এই সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি পাঠ ও আলোচনা করিলে, বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলনের বহু নূতন উপকরণ সংগৃহীত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থার ঐতিহাসিক উপকরণ বাঙ্গালা দেশ হইতেই পাওয়া যাইবে; এবং এগুলি সংগৃহীত হইলে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও লুপ্ত হইবার কারণগুলি বিশদভাবে জানা যাইবে। পালি সাহিত্যে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ইতিহাস, সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যযুগের উন্নতাবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়, তেমনি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও বৌদ্ধধর্ম্মে তান্ত্রিক অভ্যুত্থান ও ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপের ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের লোক যাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে ইতিহাস লিখিতে সমর্থ হয়, সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইতে

হইবে। বিদেশীয় লেখকগণ সময়ে সময়ে ভারতবাসিগণের ভাব ও উদ্দেশ্য সম্যক্ অনুধাবন করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে ভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে যখন য়ুরোপীয়গণ ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ও ইতিহাস লইয়া আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা যে পরিমাণে ভ্রান্তি করিতেন, পরবর্ত্তী কালে তাহা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় (৭৮ পৃঃ) জে, সি, ম্যাথু এম্ এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থলে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "The Sakyas (as shown by Asvaghosha in his Buddha-charita) were also called *Ikshvakus, which means 'sugar cane'*. It is perhaps no more than juggling with words to say that the Calami—the cane people of Josephus—are the same as the Sakyas and that therefore the pious Jew of Aristotle was a Buddhist." ইক্ষ্বাকু বংশের 'ইক্ষ্বাকু' শব্দ দেখিয়াই ম্যাথু সাহেবের 'ইক্ষুর' কথা মনে পড়িয়া গিয়াছে; তাই তিনি 'ইক্ষ্বাকু' শব্দের অনুবাদ করিতে গিয়া sugar-cane শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারিয়া তিন যে ভ্রম করিয়াছেন, সেই ভ্রমই তাঁহার একটি সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইয়াছে। এইরূপ ভ্রম স্বাভাবিক, ইহা অপরাধ নহে। কিন্তু মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচিত "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থের প্রথম কয়েক পরিচ্ছেদে Weber প্রভৃতি দুই একজন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, তাঁহাদের যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছেন, সে গুলি ঐ পণ্ডিতমণ্ডলীর ইচ্ছা-প্রসূত। এরূপ অবস্থায় ইহা যে গুরুতর অপরাধ তাহা সহজেই অনুমেয়। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতাকে সাধ্যমত অপ্রাচীনরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, ভারতের গৌরবময় অতীত সত্যসমূহকে কল্পনা-প্রসূত বা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবার প্রয়াস, বা ভারতীয় যে কোন গৌরবময় কাহিনীর বিরুদ্ধে অযথা বিরুদ্ধভাব লেখনী সাহায্যে প্রচার করা, বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মাত্র ঐ উদ্দেশ্যের পোষকতার জন্য সত্যের বিরুদ্ধে

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনোযোগ আবশ্যক।

লেখনী চালনা করা সঙ্গত নহে। আমাদের অতীত ঐতিহাসিক সত্য জ্ঞানলাভের পথে এগুলি গুরুতর প্রতিবন্ধক। অনেক সময়ে বৈদেশিক পণ্ডিতগণ স্বাভাবিক ঝোঁকের বশবর্ত্তী হইয়া ভারতেতিহাস লিখিবার সময় বিভিন্ন বিভিন্ন অধ্যায়ের আয়তনের ভিতর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না। আলেক্‌জেণ্ডারের ভারত-আক্রমণের বিবরণ ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা অধিকার করে কিন্তু অশোকের ন্যায় লোকপ্রিয় আসমুদ্র ভারত-সম্রাটের রাজত্বের বিবরণ মাত্র কয়েক পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হয়। লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল, এল, এ ওয়াডেল (L. A. Waddell) সাহেব ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক্ রিভিউ পত্রিকায়, সংস্কৃতভাষা, এমন কি বৈদিক সংস্কৃত, খৃষ্টপূর্ব্ব দুই শত অব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না, ইহা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল মাত্র এসিয়াটিক্ রিভিউ পত্রিকায় নহে, অন্যত্রও তিনি এই মর্ম্মে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতের পোষকতাকল্পে তিনি অধ্যাপক সেস্ (Sayce) সাহেবের (Introduction to the Science of Language, p. 172) উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উক্ত অধ্যাপকের মতে ভাষাগঠনের দিক হইতে পরীক্ষা করিলে গ্রীক্ ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া মনে হয়। ওয়াডেল্ সাহেবের উক্তি উপরি-লিখিত দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে, তাহা বলা কঠিন। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে আমাদের দেশবাসিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে ইতিহাস রচনায় শিক্ষিত করিতে হইবে। পক্ষান্তরে তাঁহারা যাহাতে স্বদেশবাসীর গৌরববৃদ্ধির মানসে পক্ষপাত না করেন সে দিকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ব্যক্তি, জাতি, ঘটনা, বা দেশ বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ও কোন কোন বিষয়ে অতিবিশ্বাস প্রভৃতি দোষ সাধ্যমত তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে। নচেৎ প্রকৃত ইতিহাস লেখা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িবে। ইহা সুখের বিষয় যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বহু দেশবাসী আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালাদেশের বহু স্থানীয়, প্রাদেশিক, এবং জেলার ইতিহাস ও বিবরণ রচিত হইয়াছে। সেগুলির ভিতরে ইংরাজী ভাষায় লিখিত District Gazetteer প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক সময়ে অধিক সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্ত ইতিহাসের সকলগুলি, বৈজ্ঞানিক প্রণালী

অনুসারে লিখিত ও আদর্শস্থানীয় না হইলেও, বাঙ্গালার ভবিষ্যত ইতিহাস-রচনাকার্য্যে এগুলি যে সাহায্য করিবে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার প্রাদেশিক ইতিহাস যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, ইহার পরিমাণ আরও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লিখিবার ধারাকেও উন্নত করা চাই এবিষয়ে য়ুরোপ উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক ফ্রেড্রিক হ্যারিসন্ বলেন প্যারিসের ইতিহাস সম্বন্ধেই আশি হাজার পুস্তক ও সত্তর হাজার এন্‌গ্রেভিংস্ (Engravings) আছে (The Meaning of History, p.386)। জনৈক লেখক বলেন, নেপোলীয়নের উপর লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ ও পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং বিভিন্ন ভাষায় ঐসম্বন্ধে লিখিত পুস্তক এত বেশী যে, একজন লোক যদি প্রত্যহ একখানি হিসাবে গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করেন, তাহা হইলেও ঐসমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া শেষ করিতে তাঁহার এক শত বৎসর অতি-বাহিত হইবে।

ভূ-গর্ভ খনন দ্বারা ঐতিহাসিক উপকরণাদি সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার, প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালার জন্য তাহার অতি সামান্য অংশও তাঁহারা ব্যয় করেন না। মনে হয়, যেন এই দেশের জন্য তাঁহাদের মনোযোগ একেবারেই নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের প্রায় প্রতি জেলাতেই এমন অনেক স্থান আছে, যেগুলি খনিত হইলে ইতিহাসের বহু মূল্যবান্ উপকরণ,—বহু রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ, লুপ্ত হিন্দু-মন্দির বা বৌদ্ধ-বিহার, প্রস্তর মূর্ত্তি, তাম্রফলক, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে। অতীত কালের এই সমস্ত লুপ্ত ও অমূল্য স্মৃতিচিহ্নগুলির উদ্ধারের জন্য সরকারী বা বে-সরকারী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যদি চেষ্টা না করে, তাহা হইলে আমাদের দেশের ও জাতির অতীত ইতিহাস চিরতমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে।

বাঙ্গালা দেশের প্রতি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অমনোযোগিতা।

দেশ প্রচলিত প্রবাদ, আখ্যায়িকা প্রভৃতির ভিতর হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা, ইতিহাস রচনার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিলেও, এগুলি অতি সাবধানে সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ইহাদের প্রকৃত মর্ম্ম স্থিরভাবে উপলব্ধি করিয়া তথ্যানুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। মালদহ

জাতীয় শিক্ষা-সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় মালদহের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বহু পরিশ্রম স্বীকারে পল্লীবাসী জনগণের নিকট হইতে অতি সাবধানে জনশ্রুতি, আখ্যায়িকা, গ্রাম্যপ্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক উপকরণ উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতার ফলে এসম্বন্ধে যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকলেরই প্রণিধান করা উচিত।

বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত আখ্যায়িকা প্রভৃতি হইতে ইতিহাস লেখার চেষ্টা।

"ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য মধ্যে মধ্যে অরণ্য মধ্যস্থ কোচ, পলিহা প্রভৃতি অসভ্য অথচ সরল, সত্যবাদী জনগণের সহবাসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এই সূত্রে গোশালে, তৃণ শয্যায়, বিনা প্রদীপে রাত্রি-বাস করিতে হইয়াছে। কখন কখন অনাহারে বিনা জলপানে দিন কাটাইতে হইয়াছে। বনমধ্যে মশকের উপদ্রব যথেষ্ট; ভীষণ মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘুঁটে ও তুষের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া সরল কৃষকগণের সহিত বিবিধ সুখদুঃখের কথার মধ্য দিয়া, দেশের ইতিহাস সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া যায়। তাঁহাদের সহিত মিশিতে না পারিলে, তাঁহারা আগন্তুকের সহিত মন প্রাণ খুলিয়া কোন কথাই বলিতে চাহেন না। দিবসে তাঁহাদের সহিত আলাপের সম্ভব নাই, কারণ তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। রাত্রে তাঁহাদের অবকাশ হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা দেশের বংশপরম্পরাগত প্রবাদ অবলম্বনে যে সমুদায় কথা বলিয়া থাকেন, তাহা ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য। তাঁহারা দেশের পুরাতন রাজধানীর কথা, শিল্প-বাণিজ্যের কথা, নদীর কথা, দেবতার কথা, দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতির কথা সরল মনে বলিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষিকর্ম্মোপলক্ষে কোথায় কি পাইয়া থাকেন, কোথায় কি দেখিয়াছেন, কি প্রাচীন দ্রব্যাদি তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সরল ভাবে সরল প্রাণে যাহা বলেন, নবাগত ভ্রমণকারিগণ সহস্র চেষ্টাতেও তাহা অবগত হইতে পারেন না। দেশের লোকে কি ব্রত করে, কি ব্রত কথা বলে, কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করে, এবং তাহাদের পূজাপদ্ধতিই বা কি প্রকারের, তাহা তাঁহাদের সহিত না মিশিলে, তাঁহাদের সহিত এক না হইলে, কখনই অবগত হওয়া যায় না।" তিনি আরও বলেন যে

এই ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ও তাঁহার মন্তব্য।

"আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ কেবল মাত্র রাজদরবারের এবং রাজ-পরিবারের কার্য্যকলাপ ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইতিহাস উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সরকারী চিঠি, দলিলপত্র, যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং সৈন্যের গমনাগমনের পথের বিবরণের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমাজের প্রকৃত অভিব্যক্তির সহিত পরিচিত নহেন। বিশেষতঃ প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থার বিবরণ বিবর্জ্জিত এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসসমূহ কেবলমাত্র বিজেতৃগণের দ্বারাই রচিত হইয়াছে।" (১)

সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপকরণের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয় ও কোন্‌টী বর্জ্জনীয় তাহা বিশেষ সাবধানে ও ধীরতার সহিত বিচার করিতে হইবে। উপকরণ গ্রহণ বর্জ্জণ-ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেই ঐতিহাসিকের সাধনা সফল হইবে। ইংরাজী ভাষায় এসম্বন্ধে কয়েকটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে যথা,

প্রমাণপঞ্জী বিচারে সাহায্যের জন্য বিশিষ্ট গ্রন্থ।

H. B. George রচিত Historical Evidence, L. E. Rushbrook Williams-এর Four Lectures on the Handling of Historical Material, J. W. Judwine রচিত Manufacture of Historical Material নামক গ্রন্থে Great Britain ও Ireland-এর ইতিহাস সম্পর্কিত নজীরগুলির বিশেষ আলোচনা থাকিলেও মাঝে মাঝে সাধারণ মন্তব্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রবাদ, আখ্যায়িকা প্রভৃতি হইতে সত্যনির্দ্ধারণ করিবার উপায় জানিতে হইলে, G. L. Gomme রচিত Folklore as an Historical Science নামক গ্রন্থখানি পাঠ করা প্রয়োজন।

বাঙ্গালা ভাষায় প্রামাণিক ইতিহাস দেখিতে বোধ হয় প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ইচ্ছা হয়; এবং আমাদের মাতৃ-ভাষার ভাণ্ডার যাহাতে ঐতিহাসিক

বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির উপায়।

সাহিত্যসম্ভারে পরিপুষ্ট হয়, ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই আন্তরিক কামনা। জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। জাতীয় জীবনে যে সমস্ত অভাব ও আকাঙ্ক্ষা অনুভূত হয়, জাতীয় জীবনের গতি যে খাতে প্রবাহিত হয়, জাতীয় সাহিত্য বহুল পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করে। আমাদের দেশে বাঙ্গালায়

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ, পৃঃ ১২৮, ১৩৩।

লিখিত ঐতিহাসিক সাহিত্যের জন্য প্রবল অভাব অনুভূত না হইলে, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিবে না। ইংরাজী ভাষার আওতায় পড়িয়া আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধনের অন্তরায় ঘটিয়াছে। ইতিহাস পাঠের যে ইচ্ছা সাধারণতঃ আমাদের হয়, তাহা আমরা ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে মিটাইয়া লই। ইহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ইতিহাস সমূহ তেমন উৎসাহ ও পোষকতা পায় না। ইংরাজী সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় হওয়া উচিত, মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস শিখাইবার মানসে বাঙ্গালী ছাত্রকে প্রথম হইতেই ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস পড়ান হইতেছে। এ প্রথা সমীচীন নহে। কারণ প্রথমে বিদেশীয় ভাষাকে আয়ত্ত করিতে, তাহার খুঁটিনাটি ও ব্যাকরণের ব্যূহ ভেদ করিয়া মর্ম্মার্থ বুঝিতে বহু সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। ইহারই জন্য ইতিহাস পাঠে বাঙ্গালী ছাত্রদের তেমন অনুরাগ ও আগ্রহ হয় না। পক্ষান্তরে যদি মাতৃভাষায় ইতিহাস পড়ান হয়, তবে অল্প সময়ের মধ্যে সহজেই ছাত্রেরা ইতিহাস বুঝিতে ও আয়ত্ত করিতে পারে। আর ইহার ফলে, ইতিহাস পাঠে তাহাদের অনুরাগ ও আগ্রহ সমধিক বর্দ্ধিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত ইতিহাস পাঠের সম্যক্ আবশ্যকতা অনুভূত না হইলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিবার জন্য লোকের আগ্রহ জন্মিবে না। এই জন্যই এদেশে বাঙ্গালা ভাষাকেই ইতিহাস অধ্যাপনার বাহন করা উচিত।

ইংরাজী বা অন্য কোন বিদেশীয় ভাষায় লিখিত অনুবাদযোগ্য গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারাও বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সাহিত্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় "সমসাময়িক ভারতের" ন্যায় অনূদিত ঐতিহাসিক গ্রন্থমালার বিশেষ প্রয়োজন।

অভিভাষণ দীর্ঘ হইয়া গেল, তাই মুসলমানদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিলাম না। মৎপ্রণীত Promotion of Learning in India by Muhammadans নামক গ্রন্থে তাঁহাদের সম্বন্ধে আমি অনেক কথা বলিয়াছি।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, দুই তিন হাজার বৎসর ধরিয়া

হিন্দুজাতির মাথার উপর দিয়া, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা, বহু বিপদ-আপদ বহিয়া গিয়াছে। তাঁহারা রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা অবস্থাবিপর্য্যয়ে, তাঁহাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, এবং ক্রিয়া-কর্ম্ম—সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহারা রাষ্ট্র-নীতি, অর্থ-নীতি, সমাজ-নীতি, শিল্প-কলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য. সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবহারিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন, হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এবং জাতি-বিভাগকে উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইতে না দিয়া, যেভাবে উহাদিগকে আত্মরক্ষার সহায়করূপে পরিণত করিয়াছিলেন,—তাহা হইতে, তাঁহাদের বংশ-গণের অনেক শিখিবার জিনিস আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। মিশর, এসিয়ামাইনর ও পারস্যদেশের বহু প্রাচীন জাতিগুলি, একদিন ধনে-মানে, বলে ও সভ্যতায়, গৌরবের সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন কোন কারণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের জীবন-যাত্রার পথে এমন অনেক জটিল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, সেগুলির সমাধান ও দূরীকরণ করিতে না পারিয়া, পৃথিবীর বক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে চির-বিদায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুজাতির বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদেরও মাথার উপর দিয়া বহু ঝঞ্ঝাবাৎ বহিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ধরণীর বক্ষে মস্তকোত্তলন করিয়া আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। প্রবীণ মানবতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে এক অভিনব আশার-বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালী স্নায়ুবিধানে ক্ষীণ হয় নাই; ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমে অবনত হয় নাই। কতিপয় বৎসর হইল এই জাতির যে উদ্যমশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। এত অল্পদিনে এমন প্রকাণ্ড সাহিত্য কোন্ জাতি গড়িতে পারিয়াছে? এত অল্পদিনে, শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যে এত উদ্যমশীলতা কোন্ জাতি দেখাইতে পারিয়াছে? বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচয় আপনাদের সমক্ষেই সশরীরে বর্ত্তমান; সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি বাঙ্গালীর (স্নায়ুশক্তি) ও মন অধঃপতিত হয় নাই। যদি তাহাই হইল তবে যিনি

উপসংহার।

জাতীয় মঙ্গলকামী অর্থাৎ যিনি প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার নিরাশ হইবার কারণ নাই।" নানাপ্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও, এই যে মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রহিয়াছে ইহা সুখের বিষয় হইলেও, যাহাতে ইহা ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং ইহার বীজ বহুক্ষেত্রে রোপিত হয়, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে এ শক্তির হ্রাস হইবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলিকে অপসারিত করিয়া যাহাতে তাহাদের স্থলে অনুকূল অবস্থার উদ্ভব হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। পৃথিবীতে যে সমস্ত জাতি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সাধারণতঃ কোন না কোন বিশেষত্ব দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে হিন্দুগণ যে যে বিষয়ে তাঁহাদের প্রাধান্য ও বিশেষত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে ধর্ম্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা হইতেছে প্রধান। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ এই দুইটি মহামূল্য সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে অধ্যাত্ম-বিদ্যার বহুল প্রচার ও বিস্তৃতি না থাকিলেও, ভারতবর্ষে এখনও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ঐ বিদ্যাকে করায়ত্ত করিয়াছেন। কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা নহে, তাঁহাদের সমাজ-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি ব্যবহারিক অনেক বিষয়, প্রাচীন ও আধুনিক কালের মধ্যে যাহা ছিল ও আছে, তাহা হইতে অনেক হিতকর জিনিস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে উপযুক্তভাবে সেগুলিকে যদি আমরা ব্যবহার করিতে পারি, তবে অনেক বিপদ-আপদের হস্ত হইতে আমরা মুক্তি পাইতে পারিব। কোন জাতির ইতিহাস গঠনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, সেই জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ ও পরিস্ফুট চিত্র দেখিয়া বর্ত্তমানে সেই জাতির নিকট হইতে শিক্ষা করিবার যদি কিছু থাকে,—সেই জাতির পতনের কোন চিত্র দেখিয়া যদি আমাদের কোন বিষয়ে সাবধান হইবার থাকে, তাহা হইলে আমরা যাহাতে শিক্ষিত ও সাবধান হইতে পারি। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট হইতে অনেক শিখিবার আছে। তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া, আমরা যেন আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করিতে সমর্থ হই। যে সত্যানুসন্ধানের জন্য ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন,

যে সত্যকে আশ্রয় ও অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অধ্যাত্ম বিদ্যার অধিকারী হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, সেই সত্যকে আমাদের আশ্রয় করিতে হইবে—আর তাহারই সন্ধানে নিযুক্ত হইয়া আমরা নবোৎসাহে ইতিহাস আলোচনায় ও ইতিহাস সেবায় আত্মনিয়োগ করিব। অতীতের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র—যে মন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়া হিন্দুগণ একদিন জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন, আর যাঁহাদের অযোগ্য বংশধর হইয়া, আমরাও আজ প্রাচ্য ভূমির মুখোজ্জ্বল পূর্ব্বক সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎকে এখনও সমাজ-নীতি, রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম-নীতি সম্বন্ধে বহু শিক্ষা দিতে পারি,—সেই মন্ত্রের—সেই অধ্যাত্ম-বিদ্যার সাধনায় আবার আমরা আত্মসমর্পণ করিব। আমাদের এই আত্ম-সমর্পণ যদি সার্থক হয়, এ সাধনা যদি পূর্ণ হয়, তবে আমাদের ইতিহাস সেবা ধন্য, সার্থক, ও কল্যাণপ্রদ হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্দ্দশ অধিবেশন

নৈহাটী—২৪ পরগণা।

প্রথম দিন—৮ই আষাঢ় ১৩৩০, ২৩এ জুন ১৯২৩, শনিবার

বেলা ১২টা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ত্রয়োদশ-অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া বর্ত্তমান অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতিগণ ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণ, সাহিত্যিক ও দর্শকগণ সভামণ্ডপে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিলেন। তৎপরে নৈহাটীর ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাবের ঐক্যতান বাদন হয়।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন করিলে নিম্নোক্তভাবে সভার কার্য্য সম্পাদিত হয়।

১। (ক) বালিকাগণ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় মহাশয়-রচিত **"বরণ-মঙ্গল"** গানটি গীত হয়;—

আজি, বাণী-সভাতলে লহ লহ গলে এই দীন ফুলমালা,
বঙ্কিম-স্মৃতি, বঙ্কিম-প্রীতি আশিস্-অমিয়-ঢালা।
মা'র ভাঙ্গা-ঘরে জ্বলিল আজিকে হাজার উজল বাতি,
পূর্ব্ব-গগনে নব রবি-ছবি, কাটিল আঁধার রাতি।
মোদের জীবনে আজি নব উষা, দিক্ নব প্রাণ, দিক্ নব ভূষা,
নূতন করিয়া সাজাব আমরা মা'র পূজারতি-ডালা।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় মহাশয় রচিত "বঙ্কিম-তর্পণ" নামক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হইল;—

আজি, স্মৃতি-তর্পণে এস,
আজি, প্রীতি-তর্পণে এস,

আজি, গীতি-অর্চ্চনে বাণী-পীঠ-তলে ছোট বড় সবে মেশ'
ভক্তি-লিপ্ত অশ্রু-মালিকা স্মৃতি-পূজা-উপচার,
প্রেম-মধু-ভরা চিত-শতদল দাও দাও উপহার,
কুণ্ঠা-বিহীন হাজার কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠুক গান—
"বন্দি তোমায় বাণীর তনয় বঙ্কিম, সুমহান্।"
আজি, সব ভেদাভেদ ভুলে, গাও গান প্রাণ খুলে,
সুরের লহরে নিখিল-চিত্ত উঠুক হর্ষে দু'লে।
গঙ্গা-জলেতে গঙ্গার পূজা, এই চিরাগত রীতি,
তাঁরি রচা-গান গেয়ে আজি হোক, তাঁর পূজা তাঁর প্রীতি।
ভারত-মাতার বন্দনা-গান, সে গান যাঁহার দান,
বন্দি সে বীর বাণীর তনয় বঙ্কিম সুমহান্।

প্রথম প্রস্তাব—২। গত বর্ষের নবম প্রস্তাবানুসারে সম্প্রদায়-বিশেষে নিম্নলিখিত মঙ্গলাচরণ পঠিত হয়। ইহা প্রথম প্রস্তাবরূপে গণ্য হইল।

(ক) শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বাঙ্গালা-ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিলেন।

(খ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় মঙ্গলাচরণ করিলেন।

৩। পরে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় স্বরচিত "আবাহন" নামক কবিতাটি পাঠ করিলেন ;—

আলাপে

স্বাগত হে, মহাতীর্থে স্বাগত হে, বাংলার সুধীবৃন্দ যত,
বঙ্কিমের জন্মভূমে আবাহন করি সবে ক'রে শির নত,
ধন্য কর, ধন্য কর, বিদুরের ক্ষুদ্র পূজা করিয়া গ্রহণ—
মন আছে, প্রাণ আছে, নাহি শুধু উপচার কোন আয়োজন ;
এস আজি, গঙ্গাতীরে বাঙ্গালীর মহাতিথি দশহরা দিনে,
স্নানান্তে সভার মাঝে আসীন হইয়া লহ আমাদের কিনে,
জাগাও এ প্রাণহীন গণ্ডগ্রামে নব প্রাণ—নূতন আশ্বাস,
তোমাদেরি আঁখিপাতে ফিরিয়া আসুক্ আজ হারাণো বিশ্বাস।

কল্পনায়

কে জানে গো সে যুগেতে যে যুগেতে ইতিহাস মেলেনি নয়ন—
হয়ত আছিল হেথা দেব-দ্বিজ অভীপ্সিত পুণ্য তপোবন,
এখানে উঠিয়াছিল সুধামাখা ঋষিকণ্ঠে সামবেদ গান—
ফুটেছিল নবযুগে বঙ্কিম-লেখনী-মুখে যার ক্ষীণ তান,
হয়ত সে তপোবনে মহাযোগী যোগবলে যোগীশ্বরে লীন—
উদ্ভাসিত পুণ্যচ্ছটা কলিযুগে কালক্রমে আজ যাহা ক্ষীণ।
যেখানে মণ্ডপ আজ হয়ত সেখানে কোন সত্য শকুন্তলা
অনুসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় সাথে ল'য়ে ক'রেছিল খেলা,
হয়ত দুষ্মন্ত কোন মৃগ অনুসরি' আসি মুগ্ধ দূর হ'তে,
হেরি তন্বী শকুন্তলা রত বৃক্ষ-সিঞ্চনেতে ঘট ল'য়ে হাতে।
আরও পরে হয়ত গো ধীরে ধীরে মুছে গিয়ে মানব-জীবন—
হ'য়েছিল এই ভূমি শ্বাপদের বিহারের গহন কানন।
কালক্রমে পুনরায় মানবের করস্পর্শে উঠিল জাগিয়া,
আমাদের এই ভূমি বিধাতার অপরূপ আশীর্ব্বাদ নিয়া,
প্রভাতে প্রভাতী-স্তোত্রে গঙ্গাতীর পুনরায় উঠিল গো ভরি,
সন্ধ্যার বন্দনা-গান আকাশে-বাতাসে ভাসে বিধাতায় স্মরি,
বিলাস অজানা ছিল, ভোগের বাসনা তবে ছিল না অসীম,
গুণকর্ম্ম অনুসারে কর্ম্ম করি মানবের কেটে যেত দিন ;
স্বাস্থ্য ছিল, তুষ্টি ছিল, ছিল শান্তি, ছিল সুখ মানবের প্রাণে
সাহিত্য আবদ্ধ ছিল বিধাতার কীর্ত্তিগাথা আর নাম গানে ;
অভাব ছিল না কিছু স্বভাব ছিল গো তাই দেবতার মত,
চারিটী আশ্রম পালি সকলেই ছিল তাই পুণ্যকর্ম্মে রত।

বিলাপে

কত রাজ্য এল গেল, হ'লো কত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন,
শত শত চিহ্ন যার বক্ষে ধরি এই ভূমি নিদ্রায় মগন।
মোগল গৌরব রবি নেমে আসে ধীরে ধীরে অস্তাচল-শিরে
অদূরে সে সপ্তগ্রাম বাণিজ্য সমৃদ্ধিভারে ফুটে ধীরে ধীরে,

এখানের অধিবাসী দাঁড়াইয়া গঙ্গাতীরে দেখেছিল চেয়ে—
শ্রীমন্ত সে গিয়েছিল সপ্তডিঙা ভাসাইয়ে এই গঙ্গা বেয়ে ;
দেখিল সে সপ্তগ্রামে বাণিজ্যের পীঠস্থানে বাঙ্গালীর সাথে
'সাত সমুদ্দুর' হ'তে দাঁড়াইল শ্বেতকায় পসরা সে মাথে ;
ওলন্দাজ সাথে সাথে ফরাসী ও দিনেমার পর্ত্তুগালবাসী
ইংরাজের হিংসা করি বাণিজ্যের নবরাজ্য স্থাপিল গো আসি।
সপ্তগ্রাম-বাসীদের অপরূপ কীর্ত্তি আর গৌরব টুটিয়া
দেখিল সে হুগলীতে মুসলমান শত কীর্ত্তি উঠিল ফুটিয়া।
শ্রীধাম হইতে আসি মহাপ্রভু গিয়াছেন এই গ্রাম বেয়ে—
শ্রীবাসের অঙ্গনেতে মহাতীর্থ বৈষ্ণবের পুকুরেতে নেয়ে,
বিষ্ণুপুর রাজগুরু 'শ্রীনিবাস' দিলা মন্ত্র কন্দর্পের কাণে,
সমাধি আজিও যাঁর 'গৌড়ীয়ার' শত স্মৃতি জাগায় গো প্রাণে !
শ্রুতি স্মৃতি চর্চ্চা হ'লো আমাদের নৈহাটী ও ভট্টপল্লী মাঝে,
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব উঠিল ফুটিয়া হেথা নব নব সাজে ;
এখানে আসিত ছাত্র শিক্ষালাভ হেতু সবে নবদ্বীপ-কোলে
শাস্ত্রীর প্রপিতামহ সুপণ্ডিত 'মাণিক্য' ও ভট্টপল্লী টোলে,
আমাদেরই ভট্টপল্লী স্মৃতির সে গূঢ় তত্ত্ব দিল বাংলায়—
'হলধর' 'রাখালে'র অপূর্ব্ব বিচার-শক্তি বিখ্যাত ধরায়।
'হালিসহরেতে' জাগে 'রামপ্রসাদে'র কণ্ঠে মা'র নাম গান,
দর্শনের দেহতত্ত্ব ভক্তিরসামৃতে মিশি মুগ্ধ করে প্রাণ।
'কন্দর্পের' বংশে হ'লো 'রামকমলে'র জন্ম অভিধানকার—
'কেশব' অতুলকীর্ত্তি প্রতিভার দীপ্তখনি বংশধর তাঁর।
সেবকের নিবেদনে ফুটিল তাঁহার যেই আকুল উচ্ছ্বাস
'নববিধানের' মন্ত্রে পরিণতি পাইল সে নূতন বিশ্বাস !
'ভূদেব' 'অক্ষয়' আর 'দীনবন্ধু' 'চন্দ্রনাথ' সাথে কতজন
'বঙ্গদর্শনেতে' মা'র হেমময় সৌধ হেথা করিল স্থাপন।
'সঞ্জীব' আঁকিল হেথা সত্য মিথ্যা মিলাইয়ে ছবি গৌরবের
আজিও বাণীর তীর্থে জ্বলে ধূপ যার সৌরভের।

প্রথমে সে এইখানে বঙ্কিমের দেবকণ্ঠে হইল ধ্বনিত
'বন্দে মাতরম্' গান ভারতের বীজমন্ত্র-জাতীয়-সঙ্গীত।
এখানেই অভিষেক হ'লো বঙ্গ-জননীর নব-সিংহাসনে,
বঙ্কিম পরালো মায় অপূর্ব্ব হীরক হার হেথা শুভক্ষণে।

জল্পনায়

এ সকল নাহি আজ সাহিত্য-শ্মশান মাঝে স্মৃতি মাত্র লেখা!
'শাস্ত্রি-তর্করত্ন' গৃহে বঙ্গবাণী-তরে জাগে ক্ষীণ হোমশিখা!
বাণীর সেবকবৃন্দ! সুখে স্বাধিষ্ঠান হও আজি এইখানে,
'বঙ্কিমে'র পুণ্যস্মৃতি অভিষেক কর সবে ভক্তি অর্ঘ্য দানে.
হে অমৃতপুত্রবৃন্দ! মৃত যে আমরা আজ নব প্রাণ দান
কর আমাদের সবে, জাগাও গো কণ্ঠে পুনঃ নব সুরে গান,
জড়তা টুটায়ে দাও মোহ সে ঘুচায়ে দাও মুছে যা'ক্ ব্যথা,
প্রতি ঘরে ঘরে পুনঃ হউক গো মুখরিত বঙ্গবাণী-কথা।

ইহার পর, মেদিনীপুরের শাখা-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্ মহাশয় তাঁহার রচিত 'বঙ্কিম-স্মরণে' নামক নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠ করিলেন;—

খুলেছে আজিকে মন্দির-দ্বার,
এস গো তৃষিত তাপিত কেবা—
মায়ের পূজার নব আয়োজনে
কে দিবে অর্ঘ্য, করিবে সেবা!

তোরণ-দুয়ারে মঙ্গল-ঘট
তীর্থ-সলিলে আজিকে ভরি',
পুণ্যভূমির মাটি দিয়ে সবে
পাদ-পীঠ মা'র তুলেছে গড়ি।

পতিতপাবনী-চরণ চুমিয়া
তুলেছে মায়ের মহিমা গান,
স্মৃতির সুরভি কুসুম-গন্ধে
মত্ত মধুপ ধরেছে তান।

শ্রেষ্ঠ পূজার কত ইতিহাস
এখনো হেথায় লুকানো আছে,
বঙ্কিম-পূত সাধনার ভূমি
ওই যে ইহারি বুকের কাছে!

তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করি,
মুছিয়া ফেলিতে দৈন্ত লাজ,
দীনের অর্ঘ্য পুণ্য-তীর্থে
দূর হ'তে বয়ে এনেছি আজ।

দেবতার দেখা পাইনি জীবনে,
শুনেছি মধুর জীবন-গাথা;
দাঁড়ায়ে হেথায় সম্ভ্রমে তাই
শতবার আজি নুইছে মাথা।

* * *

তিরিশ বছর আগেকার কথা—
বাঙ্গালীর দীপ নিভিল যবে,
সেই যে বিরাট্ আঁধারে ঘিরেছে,
চিরদিন কি গো তেমনি রবে?

মিলিত-কণ্ঠে আজিকার দিনে
তোমারি অপার মহিমা গাহি,
আবার তোমারে নূতন করিয়া
বাঙ্গালীর মাঝে পাইতে চাহি;

নিরজনে কবে পল্লী মায়ের
নিবিড় স্নেহের কোমল বুকে,
ছায়াঘন ঐ বকুলের আড়ে
সুরভি কুসুম ফুটিলে সুখে ;

সৌরভে তব ছাইল ধরণী
আকাশ-বাতাস আকুল করি,
কীর্ত্তি তোমার হইল অমর
গর্ব্বে হৃদয় উঠেছে ভরি।

বঙ্গভাষার দীনতা দেখিয়া
নূতন করিয়া গড়িতে তারে,
সরস করিলে ভাব-সম্পদে
ভাষার নবীন অমৃতধারে ;

নির্ঝর সম নৃত্যভঙ্গে
ছুটিল লীলার লহরী তুলি,
বাঙ্গালীর ভাষা গদ্য আবার
জাগিল যুগের জড়তা ভুলি।

অন্ধ "রজনী" বক্ষের ব্যথা
বেজেছিল বড় তোমার প্রাণে,
সফল করিলে জীবন তাহার
'অমর'-হিয়ার পরশ-দানে।

ভ্রান্ত পথিকে দেখায়েছ পথ
গহন গভীর কানন পারে,
ক্লান্তি তাহার হরিয়া লয়েছ
বন-বালিকার প্রীতির ধারে।

"নন্দার" নব অলকানন্দা
বহালে বঙ্গ বধূর বুকে,
প্রীতির সুষমা ফুটালে কত না
বিকচ কমল "কমল"-মুখে।

জাগালে "ভ্রমর"-গুঞ্জনধ্বনি
স্বামীর সোহাগ স্বপনে ভরি,
আশ্রমে নব "শান্তির" ছায়ে
ত্যাগের মূরতি তুলেছ গড়ি।

সারাটি জীবন লক্ষ্যের লাগি
খুঁজিয়া ফিরেছ কত না দেশ,
জীবনে কি কাজ, জীবন ভরিয়া
ভাবনার তব ছিল না শেষ।

সংগ্রামে জিনি পেয়েছ খুঁজিয়া
ভক্তির নব পীযূষ-ধারা,
সকল সাধনা চরণে তাঁহার
লুটায়ে পড়িলে আত্মহারা।

পল্লীর ঘনশ্যাম ছায়া-কোলে
কখন উদাস রয়েছ চাহি,
সাগর বেলায় রয়েছ চাহিয়া
আপনা হারায়ে চেতনা নাহি।

বুঝি অসীমের পার হতে ওই
চরণ ফেলিয়া কমলদলে,
উড়ায়ে শ্যামল অঞ্চলখানি
বিজন পল্লী-ছায়ার তলে—

জননী তোমার আসিছেন কাছে
আলোকি ভুবন মধুরে হাসি,
ধেয়ান-মগ্ন পরাণ ভরিয়া
দেখিছ অরূপ রূপের রাশি।

উল্লাসে তুমি গাহিয়া উঠিলে
মহীয়সী মা'র বিজয়-গান,
মায়ের স্বরূপ দেখালে জগতে
জগত ভরিয়া উঠিল তান।

এই সেই তাঁর স্মৃতির শ্মশান,
চির আদরের জন্মভূমি;
ধন্য যাহার প্রতি ধূলিকণা
অমর তাঁহার চরণ চুমি।

বন্দনা মা'র গেয়ে ওঠ আজি
নব চেতনায় তাঁহারি সুরে;
উঠুক "বন্দে মাতরম্"-ধ্বনি
সারা বাঙ্গালার বক্ষ জুড়ে।

৪। উদ্বোধন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—"গত তেরটি অধিবেশনের অপেক্ষা এই চতুর্দ্দশ অধিবেশনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তেরটি অধিবেশনই জেলার সদর-সহরে হইয়াছে। কিন্তু এই অধিবেশন একটি পল্লীতে অনুষ্ঠিত হইল। এখানকার অধিবেশনের জন্য আমরা বাহিরের কাহারও নিকট অর্থ-সাহায্য চাহি নাই। স্থানীয় ব্যক্তিগণ ও বিশেষভাবে স্থানীয় ইংরেজ বণিক্‌গণ নানাভাবে আমাদিগকে সাহায্য ও সহায়তা করিয়াছেন। এখানকার অধিবেশনের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, আমদের শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি এই স্থানের সহিত বিজড়িত। আমাদের দেখাদেখি খানাকুল-

কৃষ্ণনগরের অধিবাসিগণ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি রাধানগরে পঞ্চদশ অধিবেশন আবাহন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।"

৫। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

৬। সভাপতি বরণ—

সভাপতি—মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর।

প্রস্তাবক—মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্‌।

৭। মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

৮। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নিজ-রচিত "বিজয়-স্তুতি" গান করিলেন;—

তুঁহি পরম জ্ঞানী রাজাধিরাজ
নরবর বিজয়চন্দ্র সকল গুণনিধান,
তোঁহারি অশেষ গুণ, গাওত সুধীজন,
ধন্য ধন্য তুঁহি মহারাজন বর্দ্ধমান,
তুহি পরমদাতা দারিদ্র্য-দুঃখহরণ,
জগতজন করত তুয়া গুণ-কীরতন।
ধন্য ধন্য ভাগ আজি, মিল তুয়া দঁরশন,
তোঁহারি আশীষ অব মাঙ্গত শৈলেন।

৯। চারি শাখার সভাপতির বরণ—

(ক) সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নাট্যকলা-সুধাকর।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সমর্থক— „ নরেন্দ্রনাথ রায়।

(খ) ইতিহাস-শাখার সভাপতি—

ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্‌ এ, বি এল্‌,
পি এচ্‌ ডি, পি আর এস্‌।

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "যদিও কুমার নরেন্দ্রনাথ বয়সে নবীন, তথাপি তিনি নানা বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যার সম্মান যদি আমরা না করি, আমাদের তাহাতে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে।"

সমর্থক—রায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর।

(গ) দর্শন-শাখার সভাপতি—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল।

সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি—

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বি এ।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন যে, "গত অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার শেষ বৈঠকে শ্রীযুক্ত জগদানন্দবাবুই এই অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দবাবু বিজ্ঞানের গুরু ও দুরূহ শব্দ ও তত্ত্বগুলি সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য সুললিত বাঙ্গালা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্বগুলি সরল বাঙ্গালায় বুঝাইতে আজ কাল তিনি অদ্বিতীয়, এ কথা বলা যাইতে পারে।"

সমর্থক—ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য।

১০। ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় স্বরচিত নিম্নলিখিত সংস্কৃত কবিতাটি পাঠ করিলেন ;—

বঙ্গীয়-চতুর্দ্দশসাহিত্যসম্মেলন-শুভাশংসনম্

শ্রীবঙ্কিমস্মরণসৌরভগৌরবাঢ্যা
বাণীপ্রবীণতনয়োচ্চয়মৌলিনদ্ধা।
মালা নবেব তনুতে নয়নাভিরামা
সম্মেলনীয়মবনীজনকৌতুকানি ॥

হরপ্রসাদাদ্ বরদাবিধানাৎ
সিদ্ধির্ন কা সম্ভবতীহ লোকে।
লক্ষ্মীসুতোঽয়ং বিজয়োঽপি লব্ধো
যদ্ভারতী-পর্ণকুটীরমধ্যে ॥

অভ্যুন্নতস্বামি-সুতীর্থ-লাভাৎ
হরপ্রসাদেন চ বর্দ্ধিতত্বাৎ।
সাহিত্যসম্মেলন-বালিকায়া-
শ্চতুর্দ্দশং বর্ষমহো বরিষ্ঠম্ ॥

নরেন্দ্র-জগদানন্দ-মেলনং ভুবি দুর্লভম্।
এষা সম্মেলনী ধন্যা নাম্না স্বার্থং বিবৃণ্বতী ॥
পূজ্যপঞ্চাননঃ পূর্ব্বমমৃতেন ন যোজিতঃ।
অশংসয়ং তথা সংসদকরোদ্ বিবুধাগ্রতঃ ॥

শ্রীবঙ্কিমাভ্যুদয়মন্দিরসন্নিধানে
স্থানে চ জহ্নুতনয়াজলধৌতপঙ্কে।
সাহিত্যসম্মিলনমেতদনুষ্ঠিতং যন্
নিষ্ঠাং গতং তদধুনা ভগবন্মুদেঽস্তু ॥

(১১) অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ মহাশয়, সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া পত্রদ্বারা ও তারযোগে যাঁহারা সহানুভূতি জানাইয়াছেন, তাঁহাদের নাম পাঠ করিলেন।

১২। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অদ্যকার সভায় উপস্থিত বঙ্কিমবাবুর নিম্নলিখিত আত্মীয়গণের সহিত সমবেত সাহিত্যিকগণের পরিচয় করাইয়া দেন এবং সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের গলায় মাল্যদান করেন।

(ক) শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতা ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র।

(খ)	শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	বঙ্কিমবাবুর দৌহিত্রগণ
(গ)	„ পুরেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	
(ঘ)	„ ব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়	
(ঙ)	„ সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত বিপিনবাবুর পুত্র
(চ)	„ চামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায়	

১৩। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

১৪। সভাপতি মহাশয়ের বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতে রচিত একটি গান শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হয়;—

ভৈরবী—কাওয়ালী

যে জানে প্রাণের ভাষা, কাণে কি তুষিতে চায়।
প্রাণহীন জনে বল, কেমনে বুঝিবে তায়!
থাকে যা'রা কথা লয়ে, বুঝিতে নারে হৃদয়ে,
বঙ্কিম তোমার প্রভা, তারা কি দেখিতে পায়।
হৃদয়ের তারে তারে, নাচাও প্রতি ঝঙ্কারে,
মনেতে রাজত্ব তব, কেবা সম মহিমায়।
কমনীয় সুতাসুত, জগতে দিয়াছ কত,
পরচিতে সুখ দিতে, সারদার করুণায়।
কাঁদাতে হাসাতে পার, তাইত হৃদয়েশ্বর,
বলে যত নরনারী, সুকবি ভাবে তোমায়।
যে অন্ধ দেখে না আলো, তার কাছে ভানু কালো।
তুমি বটে কিনা ভাল, তারে যে বুঝান দায়।
এ দেশের মেয়ে ছেলে, নবীন প্রবীণ দলে,
কেন হে সকল ফেলে, রত তব রচনায়।
বিজয় দুঃখেতে ভাসে, বঙ্গীয় কবিতাকাশে,
অকালে কেন হে কাল ঢাকিলে রবি-প্রভায়।

(বিজয়-গীতিকা)

২য় প্রস্তাব—১৫। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মৃত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যবন্ধুগণের নাম পাঠ করেন। তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সমবেত ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান হইলেন। ইহা দ্বিতীয় প্রস্তাবরূপে গণ্য হইল।

অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ, (কুমিল্লা)
অম্বিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্ (ফরিদপুর)
ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম)
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (বহরমপুর)
নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ (বীরভূম)
নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণ (কলিকাতা)
পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কাঁটালপাড়া)
ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (কলিকাতা)
বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (কলিকাতা)
বিজয়কৃষ্ণ বসু (কোতলপুর, বাঁকুড়া)
বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ (মালদহ)
রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর সি আই ই, বি এল (বহরমপুর)
মতিলাল ঘোষ (কলিকাতা)
মনোজমোহন বসু বি এল্ (কলিকাতা)
রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর এচ্ বি ই (কান্দী ও পাইকপাড়া)
রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্ (চুঁচুড়া)
যতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)
ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা)
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রাঁচী)
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি এল্ (মুঙ্গের)
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর)

১৬। সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের কতকাংশ পাঠ করেন।

১৭। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের টেলিগ্রাম পাঠ করিলেন।

১৮। ইতিহাস-শাখার সভাপতি ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পড়িতে আরম্ভ করিবার পর, কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমবেত জনমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহাকে মাল্যদান করিলেন। তৎপরে ইতিহাস-শাখার সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া শেষ করেন।

১৯। ইউনিয়ন্ ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যগণ স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় রচিত "আমার ভাষা" গান করেন।

২০। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিলেন ;—

আমি আজকে এই সভাতে আস্‌বার জন্য আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলুম। আপনারা অনেকে জানেন, আমি স্বভাবতঃ সভাভীরু লোক ; পারতপক্ষে সভায় যেতে স্বীকার করি না। এখন শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা ক্ষীণ হয়েছে ; যেটুকু বাকী আছে, মনে করি সেটুকুর আর অপব্যয় কর্‌ব না। এই জন্যই সাধারণ সভায় যাওয়া বন্ধ করেছি। আমি তাঁহার আহ্বান দ্বিধার সহিত স্বীকার করেছি। তবে এবার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থানে যখন সম্মিলন হয়েছে, তখন তাঁহার প্রতি যদি আমার সম্মান-অর্ঘ্য দিতে পারি, তা'র জন্য এসেছি। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে পূর্ব্বেই অভয় দিয়েছিলেন যে, আমাকে বক্তৃতা করতে দিবেন না ; কাজে কিন্তু তাহা হল না। আমার যা শিক্ষা হোল ভবিষ্যতে স্মরণ করবো।

আমি কি আর বল্‌বো? আমি অপ্রস্তুত ; অনেকে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। অনেকে বলেছেন, অনেকে বল্‌বেন। তবে এখানে সভ্য যাঁরা আছেন, তাঁদের চাইতে আমার অধিকার আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা দেশে বাঙ্‌লা সাহিত্যে ও ভাষায়—নূতন প্রাণের ধারা দিয়েছিলেন। যখন "বঙ্গদর্শন"

প্রথম বাহির হয়েছিল, তখন আমি যুবা বা তার চাইতেও কম বয়সের; আমি প্রাণের সেই স্বাদ পেয়েছিলুম। বাঙ্‌লা ভাষা এখন অনেক পরিপূর্ণ; তখন নিতান্ত অল্পপরিসর ছিল। একলাই তিনি একশ ছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, নভেল, সমালোচনা, কথা প্রভৃতি সকল দিকেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। সে যে কত বড় কৃতিত্ব, এখন ভালো করে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন। বাঙ্‌লা ভাষা পূর্ব্বে বড় নিস্তেজ ছিল; তিনি একাই একে সতেজ করে গড়ে তুলেছিলেন।

আগে আগে 'জয়দেব' প্রভৃতির এবং 'বেণীসংহারের' ছাঁদে সংস্কৃত ভাষারই বিস্তার হয়েছিল। সর্ব্বভারতে ভাব দান করতে হলে গ্রাম্য বা প্রাদেশিক ভাষা চলে না, এই বিশ্বাসে প্রাদেশিক বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা না করে তখন সকলে ভাব দানাদান করুতেন। ভাব-সম্পদ্ দিতে গেলেই তাঁহারা তখন সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়ে দিতেন। কিন্তু এই বাঙ্‌লা ভাষা তখন গ্রামের পরিধিকে অতিক্রম করে নাই; গ্রামের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। বাঙ্‌লা ভাষার প্রতি লোকের সেকালে সে পরিমাণ শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রদ্ধা না থাকিলেই, দুর্ঘটনা, দৈন্য; তখন তাহাই হয়েছিল। আমরা আমাদের ভাষা দ্বারা যদি হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করুতে না পারি, তবে নিজকে বিলুপ্ত করে থাকৃতে হয়। যতদিন সেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ না হয়েছিল, ততদিন আপনার উপলব্ধি কি পরের কাছে পরিচয় দিতে পারি নাই। এখন আমরা তাহা বুঝি না, কিন্তু কি পরিশ্রম ও উদ্যমের ফলে তাহা হয়েছিল—কি প্রতিভার বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা করেছিলেন, এখন তাহার কল্পনা করা যায় না। সেই প্রথম দিনে তিনি একলা ছিলেন; পরে আরও দু'চার জন হয়েছিলেন। ভাষার শুচিতার জন্য তাঁহারা কি করেছিলেন সে ইতিহাস এখন বিলুপ্ত। বিরুদ্ধতা ও বিদ্রূপ কত হয়েছিল; তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। একাই সব্যসাচী ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নানারূপে বিচিত্রভাবে গড়ে তুলেছিলেন—এটা কম আশ্চর্য্য নহে। আমরা তাঁহার দ্বারা কত উপকৃত, তাহা বলে' শেষ করা যায় না। আধুনিক যুগের যা-কিছু বাণী, সমস্ত আমাদের ভাষায় প্রকাশ করা বড় সাহস। তখন লোকে তাহা মনেই করতে পারত না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস যে বাঙ্‌লায় হয়, এটা তখন আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল; কাজেই তখনকার

কবিতাও ইংরেজীতে হইত। বাঙ্‌লা ভাষা ও বাঙালী জাতি তখন এই ভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল—বঙ্কিমচন্দ্র সেই জাতীয় ধ্বংসের প্রতিরোধ করেন। তাঁর সেই কাজটা কত বড়, আপনারা ভেবে দেখ্‌বেন।

তিনি ভাষার প্রথম বন্ধন মোচন করেন এবং ভগীরথের মত বহুদূর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর প্রবাহ প্রবাহিত করেন। তাঁহারই কৃপায় আমরা আজ এই বর্ত্তমান আকারের ভাষা পেয়েছি। আমি ভাষার জন্য নিজেও যেটুকু চেষ্টা করেছি, তাও তাঁহারই কৃপায়। আমি যে আজ এসেছি তাহার কারণ, আমার সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা আজ সকলের সম্মুখে জানালাম। আমি যে তাঁহার কাছে কত ঋণী, তাহা স্বীকার করলাম। তিনি যে অস্ত্র ও উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন, তাহা বড় কমজোর ছিল; তখনও ভাষায় শক্তিসঞ্চার হয় নাই। তিনি তখন সেই দুর্ব্বল উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেইগুলিকে তিনি খুব বুঝে-সুজে প্রয়োগ করেছিলেন। পথ ও রথ তৈয়ারী করার মত তাঁহাকে কত খাটতে হয়েছিল। সেই জন্য তাঁহাকে প্রতিভা ক্ষুন্ন করতে হয়েছে। সাহিত্যের মধ্যাহ্ন-গগনে আজ তিনি থাক্‌লে অসাধারণ প্রতিভা দ্বারা সকলকে লজ্জা দিতে পারিতেন। কিন্তু সেই প্রভাত-গগনে তিনি যে সাহিত্যের প্রাণ এনেছিলেন। প্রাণশক্তি বড় কম শক্তি নয়; তিনি ভাষাতে সেই শক্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ভাষায় ভাবের কাঠামোও ছিল এক, ধারাও ছিল এক—যেমন নাটক লেখা হলে সব "বিজয়-বসন্তের" ছাঁদে— * * * তিনি সেই ভাষায় সেই ভাবে বৈচিত্র্য এনে দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈচিত্র্য নানাভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রাণ-সঞ্চারের পরেই নানাপ্রকার রূপসৃষ্টি—আনন্দরূপ সৃষ্টি হয়। তিনি তখন ভাষার সেই প্রাণে সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যখন শুয়ে থাকি, ঘুমিয়ে পড়ি, তখন সবাই প্রায় এক—জাগলেই বৈচিত্র্যের প্রভেদ হয়। আমাদের ভাষায় প্রাণের নূতন জাগরণে পূর্ব্বের এক রকমের একঘেয়ের আর আবৃত্তি নাই। সকলেই সজাগ হয়ে প্রয়োগ করতে পাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রই এই নূতন প্রাণের জাগরণ দিয়েছেন। প্রাণ ছোট হয়ে আসে, পরে বাড়ে। তখন এই প্রাণের —এই জাগরণের আয়তনের—আকার ছোট ছিল, এখন সেই প্রাণবীজ বড় হয়ে উঠেছে। সেই জন্যই তাঁহার প্রতি আজ আমাদের এই নমস্কার নিবেদন।

ভাষায় প্রাণ সকলের চাইতে বড়; জাতির প্রাণ অপেক্ষা ভাষার প্রাণ বেশী বড়; কাজেই সেই প্রাণদানকারীকে আজ আমাদের সকলের নমস্কার। *

২১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত "অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী" গানটি গীত হইল।

২২। দর্শন-শাখার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

২৩। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় বি, এ মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

২৪। ত্রয়োদশ অধিবেশনের (মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত) অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্ মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ উপস্থিত করিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে অদ্যকার সভা ভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যার সময়ে সম্মিলন-মণ্ডপেই বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশন হয়।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর "বাঙ্গালীর খাদ্য" শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দু-কুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় "ভারতের বাহিরে হিন্দুরাজ্য" এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় "বর্ত্তমান ভারতে লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত প্রণালী" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে চিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

* বিদ্যাদিত্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ।

দ্বিতীয় দিবস

সাধারণ অধিবেশন

৯ই আষাঢ় ১৩৩০, ২৪এ জুন ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥৹ ঘটিকা

সভাপতি মহাশয় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। সঙ্গীত—দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার ভাষা" গরিফা ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব কর্ত্তৃক গীত হয়।

২। প্রস্তাবাদি—

তৃতীয় প্রস্তাব—(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণ-কল্পে সমস্ত সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি,
সমর্থক— „ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এইচ্ ডি।

এই সম্পর্কে "রমেশ-ভবন" কমিটির ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, "রমেশ-ভবন"-কমিটি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরের সহিত সংলগ্ন হইয়া "রমেশ-ভবন" নির্ম্মিত হইবে এবং তদনুসারে "রমেশ-ভবনে"র একতলার ছাদ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ প্রস্তাব—হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমনভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্,
সমর্থক—মৌলবী মহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী।

পঞ্চম প্রস্তাব—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহু সংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও যাযাবর (সার্কুলেটিং) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়নকে এবং ইংরাজী স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত-সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর

সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্,

সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকলপ্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(ক) প্রবেশিকা হইতে বি এ শ্রেণী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের রীতিমত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এবং ইংরাজি ভাষার পরীক্ষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও পরীক্ষা হওয়া উচিত। বি এ শ্রেণীর পাঠ্য-মধ্যে বাঙ্গালা ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত এবং বি এ পরীক্ষায় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইস্‌লামীয় দর্শন পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

(খ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(গ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিদ্যা-বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হউক।

(ঙ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(চ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার-সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি এবং ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, সভ্যতা (Indian Antiquities and Culture) প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও সায়ান্স ফ্যাকাল্‌টীর সদস্যগণ, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত যাবতীয় বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা হইবে—এইরূপ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এই সম্মিলন সানন্দে অনুমোদন করিতেছেন এবং এই প্রস্তাব অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া, কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সেনেট সভাকে অনুরোধ করিতেছেন। এই সম্মিলন আশা করেন যে, উচ্চতর পরীক্ষাসমূহেও যাহাতে এই বিধি সত্বর প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন। এই সম্মিলন বিশ্বাস করেন যে, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বি এ, এম্ এ প্রভৃতি উচ্চ পরীক্ষা বঙ্গভাষাতেই গৃহীত হইবে—এই মর্ম্মে ঘোষণা প্রচার করেন, তবে অল্পদিনের মধ্যে সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ অচিরকালমধ্যে বহুলপরিমাণে বঙ্গভাষায় রচিত হইবে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষায় এম্ এ পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

উপরি উক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারি বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট এবং আসাম গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিবের নিকট প্রেরিত হউক।

প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, পি এচ্ ডি,

সমর্থক— " তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ,

অনুমোদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ

" " অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ।

সপ্তম প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বাঙ্গালা দেশে কৃষিবিষয়ক পত্রিকা অধিকপরিমাণে সাধারণের বোধগম্যরূপে যাহাতে প্রচারিত হয় এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা করিয়া

পুস্তকাদি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর,

সমর্থক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অষ্টম প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার জন্য একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। মেদিনীপুর জেলায় এই কার্য্য করিবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার উপর ভার অর্পিত হউক। এবং তত্তদ্দেশ-বাসীর সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে এইরূপ সমিতি প্রত্যেক জেলায় গঠিত হয়, তাহার ভার সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর অর্পিত হউক ও প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য্য-বিবরণ উপস্থাপিত করিতে অনুরোধ করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ (কলিকাতা)

সমর্থক— „ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য (নদীয়া)

„ রামানুজ কর (বাঁকুড়া)

„ ফণিভূষণ মজুমদার (যশোহর)

„ উপেন্দ্রচন্দ্র রাহা (ত্রিপুরা)

„ বিপিনবিহারী সেন (বাখরগঞ্জ)।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় জানাইলেন যে, ২৪ পরগণায় "ব্রাহ্মণনগর অনুসন্ধান-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং পরিচালন-সমিতির সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মেদিনীপুর শাখা-পরিষৎ এইরূপ অনুসন্ধান-কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদে এই সম্মিলন আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এই সম্পর্কে স্থির হইল যে, আগামী অধিবেশনে বঙ্গের যে যে জেলায় এইরূপ অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইবে, তাহার সংবাদ সাধারণ সম্মিলন-সমিতির সভ্যগণ জানাইবেন।

নবম প্রস্তাব—প্রত্যেক জেলায় ঐতিহাসিক তথ্য ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্য (grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত

অর্থ হইতে প্রতিবৎসর কতক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখুন; এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতিবৎসর দশজন করিয়া ছাত্র ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্বের বিভাগের নির্দ্দেশমত যাহাতে প্রতিবৎসর শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, যেন তাঁহারা স্ব স্ব জেলায় প্রত্নতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। এবিষয়ে সত্বর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডকে অনুরোধ-পত্র পাঠান হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস (কাছাড়),
সমর্থক— „ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা।

দশম প্রস্তাব—বঙ্গদেশে যেসকল মেডিকেল স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদায়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু,
সমর্থক— „ জগদানন্দ রায় বি এ।

একাদশ প্রস্তাব—মানমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হাওড়ায় সম্মিলনের দ্বাদশ অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই সম্মিলন সেই প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সত্বরে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য শাখা-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক এবং এই সংবাদ কাশীমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে জ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্,
সমর্থক— „ যতীন্দ্রনাথ দত্ত।

দ্বাদশ প্রস্তাব—কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক এবং তজ্জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হউক। এই সম্মিলন আরও প্রকাশ করিতেছেন যে, যেন কোন কারণে এই স্থান রেলওয়ে কোম্পানী কর্ত্তৃক কবলিত না হয়।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, তিনি বলিলেন, যে, বঙ্কিমবাবুর স্মৃতিরক্ষা কাঁটালপাড়া বা নৈহাটীতে হইলেও, ইহা সমস্ত বঙ্গ ও সমগ্র ভারতের গৌরবের স্থানরূপে পরিগণিত হইবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন, যে পুণ্য-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই স্থানটী পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহা রেলওয়ে রাক্ষস তাহার লোল জিহ্বা বাহির করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সকলে অগ্রসর হইয়া যাহাতে সে পীঠস্থানটীকে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার জন্য সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। বঙ্কিমবাবুর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার ব্যবহৃত সমস্ত বস্তু—তাঁহার লেখনী, তাঁহার পাদুকা প্রভৃতি সযত্নে সেখানে রাখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বলিলেন, বঙ্কিমবাবু যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি এক্ষণে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অংশে পড়িয়াছে। তিনি ঐ স্থানটি অদ্য প্রাতে সম্মিলনের কর্তৃপক্ষকে দান করিয়াছেন। যাহাতে বঙ্কিমবাবুর স্মৃতি ঐ স্থানে রক্ষিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে করা প্রয়োজন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্মৃতি সমিতির হস্তে ৺বঙ্কিমবাবুর সুযোগ্য দৌহিত্র শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিমবাবুর সূতিকাগৃহের জমির অংশ দান করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করায়, এই সম্মিলন শ্রীযুক্ত দিব্যেন্দুবাবুর এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবাবুর নিকট বঙ্গের সাহিত্যিক-মণ্ডলীর পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি,
সমর্থক— „ রামানুজ কর।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব—এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিতেছেন যে, অতঃপর ওকালতি ও মোক্তারী পরীক্ষা বঙ্গভাষায় প্রচলনের সমুচিত ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
সমর্থক— „ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য।

পঞ্চদশ প্রস্তাব—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-ধারণ-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করা হউক।

(পরিশিষ্টে তালিকা দেওয়া হউক)

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,
সমর্থক— „ উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ।

সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি

কলিকাতা

১। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
২। মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, সি এস্ আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি
৩। স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সি এস্ আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি, এফ্ আর এস্
৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ
৫। ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম্ এ, এল্ এল্ ডি
৬। স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই, পি এচ্ ডি, ডি এস্ সি
৭। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
৮। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্
৯। " কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ
১০। " রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সি আই ই, আই এস্ ও এম্ বি, এফ্ সি এস্
১১। " ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্ এ
১২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
১৩। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত
১৪। " শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
১৫। " গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ
১৬। " অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্
১৭। " শশধর রায় এম্ এ, বি এল্
১৮। " জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
১৯। " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
২০। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্ এ, এফ্ জি এস্
২১। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
২২। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

২৩। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

২৪। মৌলবী মনিরুজ্জমান

২৫। মহম্মদ আকরাম খাঁ

২৬। মৌলবী নূর মহম্মদ

২৭। মহম্মদ মোজাম্মেল হক্

২৮। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি

২৯। " চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ

৩০। " হরিদাস পালিত

৩১। " হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ

৩২। " রায় জলধর সেন বাহাদুর

৩৩। " বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

৩৪। " কিরণচন্দ্র দত্ত

৩৫। মিঃ আশরফ্ আলী

৩৬। মৌলবী আবদুল বারি

৩৭। " আবদুল হামিদ

৩৮। " মোজাফ্ফর আহ্মদ

৩৯। " আবদুল হানিফ

৪০। " কাজি ইম্‌দাদুল হক্

৪১। শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ, এম্ বি

৪২। " রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ

৪৩। " রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

৪৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্

৪৫। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪৬। " দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৭। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্মালা দাস

৪৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এস্ সি, ব্যারিষ্টার

৪৯। কুমার ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি এচ্ ডি, পি আর এস্

৫০। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন বি এ

৫১। ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি, বি এ

হুগলী

১। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী
২। " মন্মথমোহন বসু
৩। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৪। " কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব রায়
৫। " দেবেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল
৬। " অক্ষরচন্দ্র সরকার

নদীয়া

১। মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুমরুমি
৪। " মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ
৫। মুন্সী মহম্মদ জমীরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ
৬। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর
৭। " বীরেশ্বর সেন
৮। রায় কুমুদনাথ মল্লিক পণ্ডিতরত্ন বাহাদুর
৯। শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী বি এল্

খুলনা

১। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ
২। " সতীশচন্দ্র মিত্র বি এ
৩। " জগৎপ্রসন্ন রায়
৪। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
৫। মৌলবী মহম্মদ আতিকর রহমান খাঁ
৬। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন

বরিশাল

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
২। " রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর, এম্, এ, বি এল্

৩। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক সুকুমার দত্ত এম্ এ, বি এল্
৪। " আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
৫। " তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
৬। " অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাহিত্যরত্ন
৭। মৌলবী হাসেম আলী খাঁ বি এল্

ফরিদপুর

১। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায়
২। মৌলবী রওশন আলি চৌধুরী
৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি আর এস্, পি এচ্ ডি
৪। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়
৫। " হারাণচন্দ্র চাক্‌লদার এম্ এ
৬। " বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্
৭। " সুবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্ এ

হাওড়া

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্
২। " দুর্গাদাস লাহিড়ী
৩। " নিত্যধন মুখোপাধ্যায়
৪। " গিরিজাকুমার বসু
৫। " অক্ষয়কুমার সরকার
৬। " অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৭। মহম্মদ নুরুল হক্
৮। শ্রীযুক্ত ধ্রুবকুমার পালচৌধুরী
৯। " বিধুভূষণ পালচৌধুরী
১০। " যতীন্দ্রনাথ ঘোষ
১১। " যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২। " ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩। " শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৪। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস
১৫। " নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
১৬। " বামাচরণ কুণ্ডু
১৭। " সতীশচন্দ্র মিত্র
১৮। " চারুচন্দ্র সিং: এম্ এ, বি এল্

ঢাকা।

১। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়
২। " রমণীকান্ত দাস বিদ্যাবিনোদ, ব্যারিষ্টার
৩। " রায় সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুর এম্ এ
৪। " উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল্
৫। " বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর এম্ এ
৬। " যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৭। " ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, ডি এল
৮। " অনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী
৯। সৈয়দ এমদাদ আলী এম্ এ
১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ
১১। " অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ

২৪ পরগণা

১। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় বি এ
২। মৌলবী মহম্মদ কে চাঁদ
৩। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ
৫। " নিখিলনাথ রায় বি এল্
৬। " রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল
৭ " চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৮। " ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্
৯। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্
১০। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী বি এ
১১। মৌলবী মহম্মদ আলী বি এল্

১২। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র
১৩। " নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ
১৪। " রায় বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর
১৫। " ডাঃ নলিনীমোহন ভট্টাচার্য্য

বর্দ্ধমান

১। মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চন্দ মহ্‌তাব্ বাহাদুর কে টি, জি সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম
২। রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সি আই ই
৩। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৪। " সন্তোষকুমার বসু বি এ
৫। " সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ
৬। " দেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এল্
৭। " ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
৮। " গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য-সাংখ্যতীর্থ
৯। " যদুপতি চট্টোপাধ্যায়

বীরভূম

১। কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর
২। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। " শিবরতন মিত্র
৪। " হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৫। মৌলবী মইনুদ্দীন হোসেন বি এ
৬। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়

বাঁকুড়া

১। রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, এম্ এ
২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাস বি এ
৩। " রাখালচন্দ্র নাগ
৪। " বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
৫। " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

৬। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
৭। " রামানুজ কর

মেদিনীপুর

১। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম্ এ, বি এল্
২। " মহেন্দ্রনাথ দাস
৩। " ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্
৪। " জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী
৫। " রাজা জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ
৬। " মন্মথনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
৭। " রায় মন্মথনাথ বসু বাহাদুর

মুর্শিদাবাদ

১। মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কে সি আই ই
২। রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, সি আই ই
৩। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়
৪। " নলিনীকান্ত সরকার
৫। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। " দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়
৭। " রামকমল সিংহ

যশোহর

১। রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি, এম্ এ, বি এল
২। শ্রীযুক্ত সতীশকণ্ঠ রায়
৩। " গিরিজাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
৪। " মনোমোহন চক্রবর্ত্তী
৫। " কেদারনাথ ভারতী
৬। মৌলবী সেখ হবিবর রহমান্ সাহিত্যরত্ন
৭। মুন্সী মহম্মদ কাশেম

কাছাড়

১। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য

২। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ,

৩। " দীননাথ দাস বি এ

গৌহাটী

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ

২। শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ

৩। " হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী

৪। " ভুবনমোহন সেন এম্ এ

৫। " আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

গোয়ালপাড়া

১। রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর

২। শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্

কুচবিহার

১। শ্রীযুক্ত কুমার নিত্যেন্দ্রনারায়ণ

২। চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ

৩। মোহম্মদ আবদুল হালিম

৪। মৌলবী দীন মহম্মদ

রঙ্গপুর

১। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তর্করত্ন

২। রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর

৩। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

৪। মৌলবী সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ বি এল্

৫। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল্

৬। সেখ ফজলল করিম বি এল্

৭। খাঁন বাহাদুর মৌলবী তস্লিমুদ্দীন বি এল্

ময়মনসিংহ

১। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, বি এল্

২। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর

৩। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর এ এস্

৪। নবাব সৈয়দ নবাব আলা চৌধুরী খাঁন বাহাদুর সি আই ই

৫। সেখ আবদুল জব্বর

৬। শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত

৭। " ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী

ত্রিপুরা

১। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা

২। কুমার " নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা

৩। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী

৪। " বরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

নোয়াখালী

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ, [illegible]

২। আবদুল ওয়াহেদ

৩। আবদুল বারি

চট্টগ্রাম

১। রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দত্ত বাহাদুর

২। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী

৩। " ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী

৪। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

পার্ব্বত্য-- চট্টগ্রাম

১। রাজা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বাহা[illegible]

২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ

১। শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি এ

২। " অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি এ

৩। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি

বগুড়া

১। নবাবজাদা সৈয়দ আলতাফ্ আলী

২। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু

৩। শ্রীযুক্ত রায় বেণীমাধব চাকী বি এল্, বাহাদুর

পাবনা

১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ
২। " রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্
৩। " সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

দিনাজপুর

১। মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় বাহাদুর
২। কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ
৩। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
৪। " বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি এল্
৫। " রামচন্দ্র সেন বি এল্
৬। মৌলবী একেমুদ্দীন আহম্মদ বি এল্

রাজসাহী

১। মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর
২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ
৩। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্, সি আই ই
৪। " ব্রজসুন্দর সান্যাল মোক্তার
৫। " শৈলেশনাথ বিশি

মালদহ

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার

পূর্ণিয়া

১। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্
২। রায় শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন বাহাদুর

ভাগলপুর

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্-এ
২। " মহাশয় তারকনাথ ঘোষ
৩ " প্রেমসুন্দর বসু এম্ এ

কটক

১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ

২। " ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ

মানভূম

১। শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্

২। " ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত বি এল্

বাঁকীপুর

১। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ্ আর হিষ্ট এস্

২। " নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্

৩। " মথুরানাথ সিংহ বি এল্

৪। " রামলাল সিংহ

কাশী

১। শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী

গয়া

১। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্

মুঙ্গের

১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্

রাঁচী

১। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি, এফ্ জি এস্

২। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র রায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্

দিল্লী

১। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

২। " পুরুষোত্তম সিংহ বি এ

জয়পুর

১। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ

মীরাট

১। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কাণপুর

১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন

২। " শচীন্দ্রনাথ ঘোষ

ষোড়শ প্রস্তাব—এই সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশনের সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যর্ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্ মহ্তাব বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে প্রতি বৎসরে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই চারি বিভাগে যে চারিটি পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত এবং কি ভাবে উহা কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য সম্মিলন পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সমর্থক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর

এই সম্পর্কে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, তিনি উক্ত চারি হাজার টাকার মধ্যে এক হাজার টাকা দিবেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই দানের জন্য সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

সপ্তদশ প্রস্তাব—সম্প্রতি আসাম গবর্মেণ্ট, বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অচ্যুচরণ চৌধুরী মহাশয়কে তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসিক ২৫৲ হিসাবে সাহিত্যিক-বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য এই সম্মিলন বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এবং আসাম গবর্মেণ্টের নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—সভাপতি

৩। সভাপতি মহাশয় স্বেচ্ছাসেবকগণকে, অভ্যর্থনা-সমিতি ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুরকে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার উদ্যম ও যত্নের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সম্মিলন-মণ্ডপ নির্ম্মাণের জন্য কন্ট্রাক্টরকে ও স্থানীয় কলের সাহেবগণকে এবং বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা সরবরাহ করার জন্য রেলওয়ে কোম্পানীকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। সম্মিলনে যাঁহারা গান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে, প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠকগণকে, কলিকাতার "বান্ধব-সম্মিলনী"কে

গরিকার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয়কে ও "তিনটী পথ" নামক পুস্তিকা বিতরণ করার জন্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্য অধিবেশনের শেষে Social service leagueএর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় এই মণ্ডপে ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে চিত্র-প্রদর্শন করিয়া একটি বক্তৃতা করিবেন।

৫। পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী অধিবেশনের জন্য কোন স্থান হইতে এপর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় নাই। এবিষয় সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

এই সময় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী এটর্ণি মহাশয় তাঁহার পিতা স্যর্ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পক্ষ হইতে আগামী অধিবেশন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের জন্মভূমি রাধানগরে আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, রাধানগর স্থানটি দুর্গম, সে স্থানে কোন সময়ে অধিবেশন হওয়া সুবিধাজনক হইবে, তাহা শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদবাবু পরিচালন-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। তদনুসারে তাহাই হইবে স্থির হইল।

৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সম্মিলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাইলেন ও বলিলেন তাঁহারই কৃপায় এই ভীষণ বর্ষাকালে এ কয় দিন বৃষ্টিপাত হয় নাই।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মিত্র বাহাদুর তাঁহার মূল সভাপতিকে ও প্রতিনিধিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৮। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও যেভাবে এই সম্মিলন সফলতা লাভ করিল, তাহা অনন্যসাধারণ না হইলেও অসাধারণ। যাঁহার ইচ্ছায় "বন্দেমাতরম্" মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-পূত এইস্থানে সাম্মলনের অধিবেশনের আয়োজন, যাঁহার অকাতর অর্থদান ও অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, আমাদের সকলের সেই পরম পূজনীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে আমরা আজ এই সম্মিলন-সমাপ্তি-বাসরে

আমাদের প্রণাম জানাইতেছি এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। তাঁহার বয়স সত্তর বৎসর, এই বৃদ্ধ বয়সে সম্মিলনের সাফল্য-কল্পে তিনি 'তন্-মন-ধন' দিয়া যেভাবে নিষ্ঠার ও একাগ্রতার সহিত সপুত্র ও সপরিবারে ইহার সেবা করিলেন, তাহা কেবল তাঁহাতেই সম্ভবে। বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষ জ্যোতিষ্ক তিনি; শ্রীভগবানের কাছে তাঁহার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি। আমার প্রীতিভাজন বন্ধু সুকবি শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় মুগ্ধ ও পুলকিত হৃদয়ে তাঁহাকে যে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছেন, তাঁহার, সমবেত সমস্ত সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের পক্ষ হইতে আমি তাহা পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের চরণে আবার আমাদের প্রণাম জানাইতেছি;—

এ বাংলার নব্য ঋষি, স্রষ্টা, হর্ষ, প্রাণ
যে বঙ্কিম, তাঁরি জ্ঞান পুণ্যদ্যুতিমান্,
তাঁরি স্নেহ লভিয়াছ ভরিয়া হৃদয়,
হে মনস্বী শাস্ত্রবিদ্ শাস্ত্রী মহোদয়!
ভট্টপল্লী-জ্ঞান-জ্যোতিঃ তোমা মাঝে উঠেছে ভাতিয়া,
বঙ্কিমের নব্য মন্ত্র তব মাঝে পেয়েছে খুঁজিয়া
ভাষা তার।
আজি তোমা করি সম্ভাষণ—
হে সরল গুণীবর, হে বঙ্কিম-স্মৃতির বাহন।

৯। ইহার পরে ইউনিয়ান ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গীত হয়। এই গানের সময় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অতঃপর আনন্দ-কোলাহলের সহিত রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় সম্মিলনের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

Bengal Social Service Leagueএর পক্ষ হইতে আগত শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় এই দিন রাত্রে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে চিত্রপ্রদর্শন করিয়া একটি বক্তৃতা করেন।